বেতারবাংলা

ভাদ্র-আশ্বিন ১৪৩১

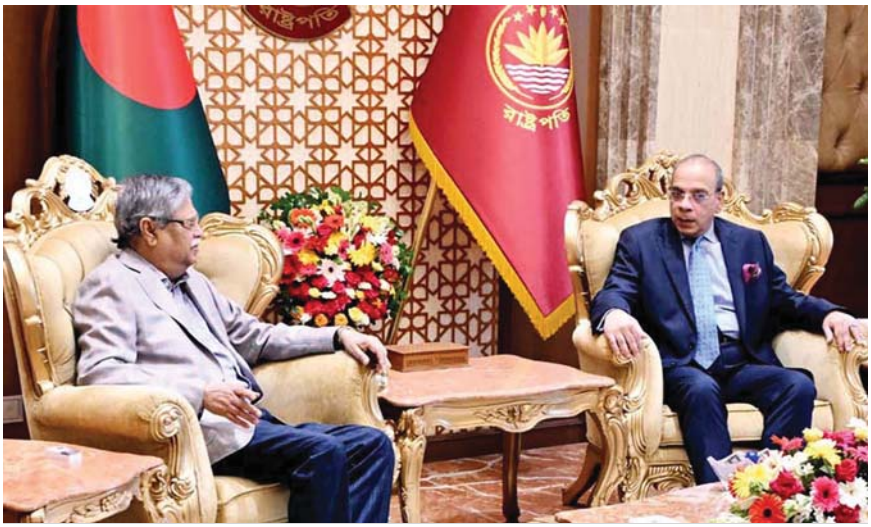

১৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের সাথে বঙ্গভবনে আপিল বিভাগের নবনিযুক্ত বিচারপতিদের সাথে নিয়ে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ সাক্ষাৎ করেন

৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের সাথে বঙ্গভবনে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান সাক্ষাৎ করেন

২৬ আগস্ট ২০২৪ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বঙ্গভবনের দরবার হলে শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে দেশবাসীর উদ্দেশে বক্তৃতা করেন। এসময় তাঁর সহধর্মিণী ড. রেবেকা সুলতানা উপস্থিত ছিলেন

বেতারবাংলা

দ্বি-মাসিক পত্রিকা

ভাদ্র-আশ্বিন ১৪৩১ • ১৬ আগস্ট ২০২৪ - ১৬ অক্টোবর ২০২৪

আঞ্চলিক পরিচালক
মর্জিনা বেগম

সম্পাদক
মোহাম্মদ রাফিকুল হাসান

বিজনেস ম্যানেজার
মোঃ শরিফুর রহমান

সহ-সম্পাদক
সৈয়দ মারগুব ইলাহি

প্রচ্ছদ
এ.কে.এম. ফজলুর রহমান

আলোকচিত্র
বেতার প্রকাশনা দপ্তর, পিআইডি,
বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্র ও ইউনিটসমূহ

মুদ্রণ সংশোধক
মোঃ হাসান সরদার

প্রকাশক
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

বেতার প্রকাশনা দপ্তর
জাতীয় বেতার প্রশাসন ভবন
৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি
শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৪৪৮১৩০৩৯ (আঞ্চলিক পরিচালক)
০২-৪৪৮১৩০৫৩ (সম্পাদক)
০২-৪৪৮১৩০০৯ (বিজনেস ম্যানেজার/ফ্যাক্স)
ওয়েব সাইট: www.betar.gov.bd
ইমেইল: betarbanglabd@gmail.com
ফেসবুক: /betarbangla.bb

নামলিপি
কাইয়ুম চৌধুরী

প্রতি সংখ্যা: ২০ টাকা
ডাক মাশুল সহ প্রতি সংখ্যা: ৩০ টাকা

ডিজাইন এবং প্রোডাকশন: কমিউনিকেটর

সম্পাদকীয়

ঋতুর রানি শরৎ। শ্রাবণের বৃষ্টিতে প্রকৃতি সাজে নতুন রূপে। আর এই সেজে ওঠা প্রকৃতিতে হালকা শিশিরে ভেজা দূর্বাঘাসের ওপর দিয়ে জাফরন রং ছড়িয়ে আসে শরৎ। গাছে গাছে নানা রং-এর ফুল আর শিশিরভেজা ফসলের মাঠে পাকাধানের ডগায় সোনালি রোদ যেন গলে গলে পড়ছে। আকাশে দীপ্তিমান নীলের আভা। ঘন মেঘের নীলিমা স্পর্শ করে মালার মতো ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায় নানা প্রজাতির পাখি। নদীর তীরে উঁকি দেয় সাদা কাশফুল। সূর্যের নরম আলোয় প্রকৃতি হয়ে ওঠে সতেজ ও সুন্দর।

শরতের এই নির্মল আবহের মাঝেই এক বিপ্লবী পরিবর্তনের সুবাস যেন বইছে আজ বাংলার আকাশে-বাতাসে। জুলাই-বিপ্লব আর শরতের শুভ্রতা আজ একাকার। এক অব্যক্ত কালো অধ্যায় যেন বর্ষায় ধারায় ধুয়ে-মুছে শরতের বিভায় উদ্ভাসিত আমার প্রিয় জন্মভূমি। অবিশ্বাস্য দুঃসময় অতিক্রম করে শুধু আশাকেই ভরসা করে- গন্তব্য যত দূরেই হোক, এগিয়ে যাবে এ জনপদ। সে শক্তি আমাদের আছে।

'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।'

মানবতার কবি নজরুল। লিখেছেন, 'গাহি সাম্যের গান/ মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।' আবার তিনিই দ্রোহে, প্রেমে, কোমলে-কঠোরে বাংলার মানুষকে দিয়েছেন জীবনের আস্বাদ। তিনি মানবতার সাথে আপোষ করেননি। তাঁর সাম্যবাদ ধর্ম-বর্ণ-গোত্র অতিক্রম করে মানব-ধর্মে বিলীন হয়েছে। তিনি সংগ্রাম করেছেন মানবতার মুক্তির জন্য। সংগ্রাম করেছেন সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে। মুক্তবুদ্ধি ও চিন্তার পক্ষে কলম ধরেছেন নির্ভীক চিত্তে। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৩৮৩ বঙ্গাব্দের ১২ ভাদ্র ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুবার্ষিকীতে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ করছি।

হিজরি বর্ষের তৃতীয় মাস রবিউল আউয়াল-এর ১২ তারিখ মহানবি হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্মদিন হিসেবে পালিত হয়। মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের এইদিনে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের একই দিনে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। দিনটি পবিত্র ইদ-ই-মিলাদুন্নবি (সাঃ) হিসেবে সারাবিশ্বের মুসলমানরা বিশেষ মর্যাদার সাথে পালন করে থাকে।

দুর্গাপূজা বা দুর্গোৎসব বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। শরৎকালে এই উৎসব হয় বলে এটি শারদোৎসব নামেও পরিচিত। সমগ্র দেশ তথা পৃথিবীর কাছে বাঙালি জাতির এই দুর্গাপূজা নিয়ে আসে প্রকৃতির সাথে মানুষের মিলনমেলার বারতা নিয়ে। যুগ যুগ ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য উদাহরণ হয়ে পালিত হয়ে আসছে এই উৎসব। শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে সকল সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সূচিপত্র

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

নতুন সামাজিক ব্যবস্থা রচনায় অর্থনৈতিক চিন্তার পুনর্বিন্যাস
ড. মুহাম্মদ ইউনূস ৩

নজরুলের নন্দনতত্ত্ব
কুদরত-ই-হুদা ১০

বাংলার শরৎ
মো. শাহাদত হোসেন ১৫

মাটি ও মানুষের শিল্পী এস এম সুলতান
জায়েদুল আলম ২৩

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স.)
মাওলানা হাফেজ কাজী মারুফ বিল্লাহ্ ৩১

দশভুজা দেবী দুর্গা
ড. কালিদাস ভক্ত ৩৬

নগর জীবনে প্রকৃতির সান্নিধ্য
প্রফেসর আবু নোমান ফারুক আহম্মেদ ৩৯

জাগো বাহে কোনঠে সবায়
ফজিলা ফয়েজ ৪৬

গল্প

লাফ দিলে পাখি হব (২য় পর্ব)
হরিশংকর জলদাস ১৮

ছাতা
সুনেত্রা বড়ুয়া ২৮

মশা
মুস্তাফা মাসুদ ৪২

বেতার ক্যালেন্ডার ৭৬

৭৯

বেতার পর্ব

কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতারের বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ৫২

পবিত্র ইদ-ই-মিলাদুন্নবি (স.) উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতারের বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ৬২

বাংলাদেশ বেতারের জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদ ৭১

বাংলাদেশ বেতারের দৈনিক অনুষ্ঠানের সময়সূচি ৭৩

কবিতা

কবিতা
রবীন্দ্র গোপ ১৪

জাতীয় কবি
গোলাম নবী পান্না ১৪

শরতের ভোরবেলা
সোহরাব পাশা ১৭

মায়াজাল
মিয়া সালাহউদ্দিন ১৭

বিষণ্ন শহর
সাবরিনা নিপু ২৭

অসমাপ্ত সোলেনামা
মহসিন আহমেদ ২৭

সুর-মূর্ছনা
সুমন সরদার ৩৮

শান্তির প্রচ্ছায়
আবু জাফর আবদুল্লাহ ৩৮

তরুপল্লব

শরতের সাজ
নকুল শর্মা ৪৯

ভালোবাসি
মো. তাইফুর রহমান ৪৯

শিশু অনুকরণপ্রিয়
জেসমিন সুলতানা চৌধুরী ৫০

ভাদ্রমাসে
মুহাম্মদ আলম জাহাঙ্গীর ৫০

একতাই শক্তি
আবদুল লতিফ ৫১

নতুন সামাজিক ব্যবস্থা রচনায় অর্থনৈতিক চিন্তার পুনর্বিন্যাস

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কি নৈতিক, সামাজিক এবং বস্তুগত ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে কাঙ্খিত ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করার দিকে আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক তত্ত্ব এবং তার প্রয়োগ যে চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে তার মাধ্যমে এই ভারসাম্য কিছুতেই সম্ভব হবে না। বরং এর মধ্যকার দ্বন্দ্বগুলি আরও প্রকট হয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে জটিল এবং অসহনীয় পর্যায়ে নিয়ে যাবে।

বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকালেই পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে এটা আসলে নৈর্ব্যক্তিক একটা শোষণ-যন্ত্র। এর কাজ হলো নীচ থেকে রস শুষে অনবরত উপরের দিকে পাঠাতে থাকা। বহু স্তরে বিন্যস্ত এই যন্ত্র ধাপে ধাপে নীচের স্তরের রস তার উপরের স্তরে পাঠায়। এর সর্বনিম্নের স্তরটি সবচাইতে বিশাল। সেখানে অসংখ্য কর্মী নিরলসভাবে বিন্দু বিন্দু করে রস তৈরি করে। তার উপরের স্তরটিতে তুলনামূলকভাবে অনেক কম মানুষ, কিন্তু যন্ত্রে তাদের অবস্থানের কারণে শক্তিতে তারা অনেক বলবান। তাই তারা নীচের সংগ্রহ করা রস অনায়াসে নিজের কাছে টেনে নেয়। উপরে যারা আছে তারা খারাপ মানুষ হবার কারণে এটা হচ্ছে তা নয়। যন্ত্রের কারণেই মূলত এটা হচ্ছে। যন্ত্রটাই এভাবে বানানো হয়েছে। স্তরে স্তরে সাজানো মানুষগুলি নীচের স্তরের রস উপরে টেনে নিয়ে নিচ্ছে তাদের শক্তির কারণে। এতে কেউ দোষের কিছু দেখে না। বরং ধরে নেয় যে এটাই জগতের নিয়ম। অথচ বিষয়টা জগতের নিয়ম না। কিছু পণ্ডিত বসে এরকম একটা শাস্ত্র তৈরি করে সবাইকে বিশ্বাস করিয়ে দিয়েছে যে, এটাই জগতের নিয়ম; এ নিয়ম মেনে চললে সবার জন্য মঙ্গল।

প্রত্যেক স্তরে মানুষের সংখ্যা তার আসন্ন নীচের স্তরের মানুষের সংখ্যা থেকে অনেক কম। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের আয়ত্তে রসের পরিমাণ হতে থাকবে নীচের স্তরের চাইতে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। শেষপর্যন্ত সর্বোচ্চ স্তরে থাকবে হাতেগোনা কয়েকজন মানুষ মাত্র। কিন্তু তাদের আয়ত্তে এত রস সংগৃহীত থাকবে যে নীচের দিকের অর্ধেক স্তরে জমানো সকল রস একত্র করলেও এই পরিমাণ রসের সমান হবে না। এর জন্য কাউকে আমরা দোষী বলতে পারছি না- কারণ শাস্ত্রে বলে দেয়া আছে এমনটিই হবার কথা। এতেই সবার মঙ্গল। বলা বাহুল্য, কোনো নৈতিক বা সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য এযন্ত্র তৈরি হয়নি। এযন্ত্র মূলতঃ তৈরি হয়েছে অর্থনীতির চাকাকে সবসময় সচল রাখার জন্য। সবসময় চোখ রাখা হয়েছে কখনো যেন অর্থনীতির চাকা কোনো চোরাবালিতে আটকে না-যায়। শাস্ত্রে নৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের নানা অবতারণা থাকলেও বাস্তবে তার কোনো প্রয়োগ নেই। বাস্তবে তার নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধের বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে পরিণত হয়েছে। সমাজ নিয়ে যারা চিন্তা করে তারা মাঝে মাঝে এটা স্মরণ করিয়ে দিলে এটা নিয়ে কিছু উদ্যোগ আয়োজনের কথা বলাবলি হয়- কিন্তু দ্রুত সবাই এসব কথা ভুলে যায়। যেহেতু যন্ত্রের গাঁথুনিতে এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়নি কাজেই এসব কখনো যন্ত্রের কার্যক্রমের সাথে একীভূত হতে পারেনি।

যেমন ধরুণ শেয়ারবাজারের কথা। বর্তমান জগতের ব্যবসার সাফল্যের মাত্রা নির্ধারণে শেয়ারবাজারের মূল্যায়নই চূড়ান্ত। কারা ব্যবসা ভালো করছে, কারা ব্যবসাকে সাফল্যের শিখরে নিয়ে গিয়ে পৌছাতে পারছে- সব বিষয়ে রায় দিচ্ছে শেয়ারবাজার। এই মূল্যায়নে কোথাও কোনো নৈতিক বিচারের মাপকাঠি কিংবা সামাজিক বিচারের মাপকাঠি ব্যবহার হয় না। কাজেই ব্যবসার প্রধান নির্বাহীর দৃষ্টিতে এসব বিষয় পুরোপুরি অপ্রসাঙ্গিক এবং বাড়তি ঝামেলা। উপায়ান্তর না দেখে সরকার এগিয়ে আসে নীচের মানুষকে কিছু স্বস্তি দেবার জন্য। সরকার উপরের স্তর থেকে রস সংগ্রহ করে নীচের স্তরে বিলি করে তাদেরকে করুণ অবস্থা থেকে রেহাই দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু যন্ত্রের কার্যক্রম অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।

এযন্ত্রকে বিনাপ্রশ্নে গ্রহণ করেছি বলে যন্ত্রটা সবচাইতে বড় যে ক্ষতিটা আমাদের করেছে সেটা হলো, আমরা সবাই আমাদের অজান্তে অর্থলোভী কলের পুতুলে পরিণত হয়ে গেছি। জীবনে অর্থ জমিয়ে নীচের স্তর থেকে উপরের স্তরে যাবার সাধনা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার আছে বলে আর মনে থাকে না। আমরা এটা জেনেই চমৎকৃত যে- যে যত উপরের স্তরে যেতে পারবে, যন্ত্রের গঠনের কারণে সে তত অল্প আয়াসে, অনেক বেশি গুণ রস সংগ্রহ করার ক্ষমতা অর্জন করবে। এমন কি সে বসে থাকলেও যন্ত্র তাকে ক্রমাগত রস জুগিয়ে দিতে থাকবে।

সামাজিক ব্যবসা

বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যেটি মৌলিক গলদ বলে আমি মনে করি সেটি হলো এমন একটি কাল্পনিক মানুষকে কেন্দ্র করে সমস্ত শাস্ত্রটিকে সাজানো হয়েছে যার সঙ্গে রক্ত-মাংসের মানুষের মধ্যে বড় রকমের পার্থক্য রয়ে গেছে। শাস্ত্রবিদরা হয়তো নির্দোষ সরলিকরণ মনে করে একাজটি করেছেন। কিন্তু সেটা শাস্ত্রকে, এবং এই শাস্ত্র অনুসরণকারী পুরো বিশ্বকে, মহাবিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। শাস্ত্রবিদরা ধরে নিয়েছেন অর্থনৈতিক জগতে যে মানুষ বিচরণ করে সে হলো শতভাগ স্বার্থপর জীব। স্বার্থপরতা ছাড়া সে আর কিছুই বোঝে না। আমি মনে করি যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সকল মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি আমরা করেছি তার মূলে রয়েছে মানুষের এই খণ্ডিত রূপকে কেন্দ্র করে শাস্ত্র রচনা।

অর্থনৈতিক শাস্ত্রে স্বার্থপর মানুষের জায়গায় আমি এমন একটি মানুষকে প্রতিস্থাপন করতে চাচ্ছি যিনি একই সঙ্গে স্বার্থপর এবং স্বার্থহীন। কারণ প্রকৃত মানুষ এই দু'য়ের সংমিশ্রণ। কে কত স্বার্থপরভাবে এবং কত স্বার্থহীনভাবে কাজ করবে তা নির্ভর করবে ঐ ব্যক্তির বেড়ে ওঠার উপর, তার সমাজ-সচেতনতার উপর, তার শিক্ষার উপর, তার নৈতিক বিচার বিবেচনার উপর। একই মানুষ স্থায়ীভাবে, কিংবা সাময়িকভাবে, কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে, প্রচণ্ড স্বার্থপর হতে পারে, অথবা দিলদরিয়া স্বার্থহীন হতে পারে, অথবা একইসঙ্গে দু'য়ের সংমিশ্রণ হতে পারে। এই ধরনের মানুষকে কেন্দ্র করে শাস্ত্র রচনা করতে হলে আমাদের দু'ধরনের ব্যবসার ব্যবস্থা রাখতে হবে। যখন মানুষ তার স্বার্থপরতাকে প্রকাশ করতে চায়, এবং প্রয়োগ করতে চায় তখন সে সর্বোচ্চ মুনাফাকারী হিসেবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করবে। যখন স্বার্থহীন হতে চায়, তখন সে এমন ব্যবসা করবে যাতে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন করার কোনো ইচ্ছাই তার মধ্যে কাজ করবে না; তার একমাত্র লক্ষ্য হবে ব্যবসায়িক পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমাজের সমস্যার সমাধান করা। আমি এই ব্যবসার নাম দিয়েছি 'সামাজিক ব্যবসা'। এই ধরনের ব্যবসা থেকে মালিক তার বিনিয়োগকৃত মূলধন ফেরত নেওয়া ছাড়া আর কোনো অর্থ মুনাফা হিসেবে নিতে পারবে না। এ ধরনের এই নতুন মানুষকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক শাস্ত্র রচনা করলে সে-শাস্ত্রে দু'ধরনের ব্যবসার ব্যবস্থা রাখতেই হবে। একটা হবে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনকারী ব্যবসা, আরেকটি হবে সামাজিক ব্যবসা। তার ফলে সকল পরিস্থিতিতে সকল মানুষের কাছে দু'টি বিকল্প থাকবে। এই বিকল্প না-থাকার কারণেই আমরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভুল পথে ধাবিত হচ্ছি এবং প্রচণ্ড সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি।

প্রচলিত অর্থনৈতিক শাস্ত্রে ব্যক্তিগত মুনাফাভিত্তিক ব্যবসার বাইরে ব্যবসার কোন ক্ষেত্র নেই। অর্থাৎ স্বার্থপর হওয়া ছাড়া ব্যবসা করার কোনো সুযোগ নেই। স্বার্থহীনভাবে কিছু করতে চাইলে দান

খয়রাতের জগতে প্রবেশ করতে হয়। দাতব্য কর্মকাণ্ডে সমাজের অবহেলিত মানুষের অনেক উপকার হয়। কিন্তু এসব কর্মকাণ্ড বরাবর পরমুখাপেক্ষী থেকে যায়। আত্মনির্ভর হবার কোনো সুযোগ এদের থাকে না। কারণ সবসময় নতুন নতুন অর্থ-সংগ্রহ করে দাতব্য কার্মকাণ্ডকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। একবার কাজে লাগালে দানের টাকা খরচ হয়ে যায়। দানের টাকা ফেরত আসে না। সামাজিক ব্যবসা যেহেতু ব্যবসা সে কারণে টাকাটা ফিরে আসে। একই টাকাকে বারবার ব্যবহার করে ব্যবসা সম্প্রসারণ করা যায়। সামাজিক ব্যবসাকে নিজস্ব ক্ষমতায় স্থায়ীভাবে টিকিয়ে রাখা যায়। সমাজের যত সমস্যা আছে সব কিছুর সমাধান সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে অর্জন করা যায়।

ব্যক্তিগত মুনাফাভিত্তিক ব্যবসা পরিচালনার জন্য জনশক্তি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা অছে। এগুলিকে বলা হয় বিজনেস স্কুল। এই শিক্ষায়তন থেকে শিক্ষা নিয়ে তরুণ ব্যবসা-যোদ্ধারা বের হয়ে আসে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য নতুন বাজার জয় করার জন্য আর কোম্পানির মালিকদের জন্য বেশি মুনাফা অর্জনের লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। সামাজিক ব্যবসা পরিচালনার জন্য বিজনেস স্কুলে পৃথক বিশেষায়িত শিক্ষার প্রয়োজন হবে। এই শিক্ষা নিয়ে তরুণরা সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা সামাধানের লড়াইতে নামবে। দুই ব্যবসায় দুই রকমের দক্ষতার প্রয়োজন। একক্ষেত্রে লাগবে মালিকদের মুনাফা বাড়ানোর জন্য সমস্ত কলা-কৌশল আয়ত্ত করা, অন্যক্ষেত্রে লাগবে ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে সামাজিক সমস্যা দ্রুত সামাধানের দক্ষতা অর্জন করা।

আয়-বৈষম্য

আয়-বৈষম্য বাড়ানোর প্রক্রিয়া পুঁজিবাদী কাঠামোতে অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত আছে। তার উপর যে প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন গড়ে উঠেছে তা এই আয়-বৈষম্য বৃদ্ধি আরও জোরদার করে দিয়েছে। পুঁজি, ঋণ, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি, শিক্ষা সবকিছুর প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন ভাগ্যবানদের পক্ষে। ভাগ্যহীনদের জন্য সকল দরজা বন্ধ। তাদের পক্ষে এই সকল দরজা খোলা প্রায় অসম্ভব। কাজেই মানুষে মানুষে আয়-বৈষম্য বেড়েই চলবে। যে যন্ত্র ক্রমাগতভাবে নীচ থেকে রস সংগ্রহ করে উপরে চালান দেবার কাজে নিয়োজিত সে যন্ত্র কখনো উপর-নীচের আয়ের ব্যবধান ঘুচাতে পারবে না। আয়-বৈষম্য আমাদেরকে এখন কোথায় নিয়ে এসেছে সেটা দেখলেই পরিস্থিতি বোঝা যাবে। পৃথিবীর সবচাইতে ধনী ৮৫ জন মানুষের কাছে যে সম্পদ আছে তার পরিমাণ আয়ের দিক থেকে নীচে আছে পৃথিবীর এমন অর্ধেক মানুষ, অর্থাৎ ৩৫০ কোটি মানুষের মোট সম্পদের যোগফলের চাইতে বেশি। অন্যভাবে তাকালেও একই দৃশ্য দেখা যাবে। আয়ের দিক থেকে উপরে আছে পৃথিবীতে এমন অর্ধেক মানুষের কাছে আছে পৃথিবীর মোট সম্পদের ৯৯ শতাংশ। অর্থাৎ নীচের অর্ধেকাংশ মানুষের কাছে আছে পৃথিবীর মোট সম্পদের মাত্র এক শতাংশ। বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কি এই অবস্থার উন্নতি হবে? না, হবে না। কারণ অর্থনৈতিক যন্ত্রটিকে কাজ দেওয়া হয়েছে উপরওয়ালাকে আরও রস যোগান দেওয়া। নীচের রস উপরের দিকে যেতেই থাকবে। আয়-বৈষম্য বাড়তেই থাকবে। নীচের তলার মানুষের মাথাপিছু যে প্রবৃদ্ধি হবে, উপরতলার মানুষের মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধি যে তার থেকে বহুগুণ বেশি হবে এটা বুঝতে কারও কষ্ট হবার কথা নয়। সামাজিক ব্যবসা নীচ থেকে উপরে রস চালান দেবার গতিটা কমাবে। পুঁজি, ঋণ,

নতুন পৃথিবী সৃষ্টির সময় এসেছে। প্রযুক্তি আমাদেরকে এই সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। আমাদেরকে পথ বের করতেই হবে। সামাজিক ব্যবসা আমাদের মনে আশা জাগায়। হয়ত সামাজিক ব্যবসা আমাদেরকে গন্তব্যে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। এই গন্তব্য হবে সবার জন্য ঋণ, সবার জন্য পুঁজি, সবার জন্য স্বাস্থ্য, সবার জন্য প্রযুক্তি, সবার জন্য সুশাসন, বেকারত্বহীন, দারিদ্রহীন, পরিবেশ দুষণমুক্ত , যুদ্ধাস্ত্রমুক্ত, শান্তিপূর্ণ, আয়ের বৈষম্যহীন এক নতুন পৃথিবী

স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি ও শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনকে সামাজিক ব্যবসা একেবারে নীচের তলার লোকের কাছে সহজলভ্য করে দিতে পারে। তার ফলে তাদের সম্পদ ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হবে। উপরের তলার অফুরন্ত সম্পদের অংশ সামাজিক ব্যবসায় নিয়োজিত হলে তাদের আরও সম্পদশালী হবার প্রবণতা কমবে। সামাজিক ব্যবসার পরিমাণ যদি ব্যক্তিগত মুনাফাকেন্দ্রিক ব্যবসার চাইতে বেশি হতে আরম্ভ করে তাহলে যত না নীচের রস উপরে যাবে তার চাইতে বেশি উপরের রস নীচে আসতে শুরু করবে।

সামাজিক ব্যবসা তাত্ত্বিক কাঠামোতে একটা উল্টো যন্ত্র স্থাপন করছে। উপরের রস নীচে আনার যন্ত্র। ব্যবসায়িক ভিত্তিতেই একই মার্কেটে দু'যন্ত্র কাজ করবে। কোন যন্ত্রটির জোর বেশি হবে সেটা নির্ভর করবে আমরা কী চাই তার উপর। সিদ্ধান্ত আমাদের হাতে, যন্ত্রের হাতে নয়। আমরা আমাদের পছন্দের যন্ত্রটা নিয়ে কাজ করব। বর্তমানে যন্ত্র একটাই। কাজেই এখানে আমাদের কোন সিদ্ধান্ত কাজে লাগে না। যন্ত্রই সিদ্ধান্ত স্থির করে দিয়েছে। আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে এটাই একমাত্র এবং সর্বোত্তম যন্ত্র। আমরা সেকথা বিশ্বাস করে কলের পুতুলের মতো এই যন্ত্র ব্যবহার করে তথাকথিত 'সাফল্যের' পেছনে যথাসাধ্য দৌড়াচ্ছি। আমাদের একটু থেমে নিজেদের জিজ্ঞেস করতে হবে- আমরা কি নিজের ইচ্ছাসম্পন্ন সৃজনশীল মানুষ হব, নাকি কলের পুতুল হব? মানুষের প্রতি মানুষের ঔদাসীন্য জয়ী হবে, নাকি মানুষের প্রতি মানুষের সহমর্মিতা জয়ী হবে? যন্ত্র জয়ী হবে, নাকি মানুষ জয়ী হবে?

বর্তমান যন্ত্র মানুষের প্রতি মানুষের ঔদাসীন্য এবং অবজ্ঞাকে সামাজিক স্বীকৃতি ও সমর্থন দিয়ে তাকে প্রশ্নাতীত করে রেখেছে। স্বার্থপরতাকে একমাত্র গুণ ধরে নিয়ে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনকে অর্থনৈতিক সাফল্যের মূলমন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। ব্যক্তিস্বার্থ বা স্বার্থপরতার একচ্ছত্রবাদ থেকে বের হয়ে আসতে না পারলে দারিদ্র, আয়-বৈষম্য, বেকারত্ব, স্বাস্থ্যহীনতা, পরিবেশ দূষণ কিছু থেকেই বের হওয়া যাবে না। অর্থনীতিকে আবিষ্কার করতে হবে যে পৃথিবীতে 'আমি' ছাড়া আরও মানুষ আছে, আরও প্রাণি আছে। সকলের সমবেত ভবিষ্যতই 'আমার' ভবিষ্যৎ। 'আমাদের' ভবিষ্যতই 'আমার' ভবিষ্যৎ।

জিডিপি কার কথা বলে?

স্বার্থপর পৃথিবীতে আমরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সাফল্যের মাপকাঠি বানাই স্বার্থপরতার একচ্ছত্রবাদকে উঁচিয়ে ধরার জন্য। যেমন যে যত বেশি ধনী, সে তত বেশি সফল ব্যক্তি। যে ব্যবসায় যত বেশি লাভ করে, সে তত বেশি সফল। যে দেশের মাথাপিছু জিডিপি যত বেশি, সে দেশ তত বেশি উন্নত। জিডিপি দিয়ে আমরা কী জানলাম? আমাদের মাথাপিছু দেশজ উৎপাদন কত হয়েছে তা জানলাম। কিন্তু তাতে দেশের এবং মানুষের পরিস্থিতির কতটুকু জানা হলো? এর মাধ্যমে কি আমরা জানতে পারলাম দেশের দারিদ্রের পরিস্থিতি কী? হয়ত দেশে বাঘা বাঘা কিছু ধনী লোক আছে যারা জিডিপি'র ৯৯ শতাংশের মালিক। তাতে সাধারণ মানুষের তো ভয় পাবার কথা। আনন্দিত হবার তো কোনো কারণই নেই। মানুষের প্রকৃত পরিস্থিতি জানতে হলে এমন একটা পরিমাপ বের করতে হবে যেটা আসবে জিডিপি'র সঙ্গে দেশের দারিদ্র, বেকারত্ব, স্বার্থহীনতা, আয়-বৈষম্য, পরিবেশ দূষণ, সকলের কাছে শিক্ষা ও প্রযুক্তির প্রাপ্যতা, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, মানবিক অধিকার, সুশাসন ইত্যাদির পরিমাপ যুক্ত করে।

স্বার্থপর পৃথিবীতে বিশ্বায়নের যে চমৎকার সুযোগটা এসেছে সেটাও চলছে উল্টোদিকে। পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্ব সৃষ্টির সুযোগ না-হয়ে এটা হয়ে পড়ছে বাজার দখলের লড়াই। এক রাষ্ট্রের শোষণযন্ত্র থাবা বিস্তার করার সুযোগ পাচ্ছে আরেক রাষ্ট্রের মানুষের উপর। বিশ্বপরিবার গড়ার জায়গায় বিশ্ব পরিণত হতে যাচ্ছে অর্থনৈতিক রণক্ষেত্রে।

প্রযুক্তি

যে মন-ধাঁধানো, চোখ-ধাঁধানো, প্রযুক্তি একটার পর একটা আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে দ্রুত বিস্তার লাভ করছে এবং তার চাইতে দ্রুততর গতিতে আমাদের জীবনকে সার্বিকভাবে প্রভাবিত করছে, তার ফল আমাদের উপর কেমন হবে? প্রতিদিন মনে হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনের অতিপরিচিত পথে একটা অজানা চমক আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সেই চমক আমাদের জীবনকে আরও উপভোগ্য করবে, সহজ করবে, নাকি কারও জন্য সহজ, কারও জন্য কঠিন করবে।

আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এটা ভালো হচ্ছে। কিন্তু যদি অর্থনীতির মূলযন্ত্রটিকে ঘিরে প্রযুক্তি এগুতে থাকে তাহলে এই নতুন প্রযুক্তি স্বার্থপরতার শক্তিকে আরও জোরদার করবে। যেহেতু স্বার্থপর পৃথিবীতে আর কিছু করণীয় দেখা যাবে না। অনেকে এই নিয়ে আপত্তি তুলবে। সমাধান হিসেবে এদিকে-ওদিকে কিছু স্বার্থহীনতার প্রলেপ লাগাবার চেষ্টা হবে। নিয়ম-নীতি ভেঙ্গে কেউ কেউ প্রযুক্তির শক্তি দিয়ে চাপা-দেয়া স্বার্থহীনতার শক্তিকে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেবে। কিন্তু মূলযন্ত্র তার কাজ নির্দিষ্ট নিয়মে করে যাবে।

প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে পাল্টে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু এই পরিবর্তন আসছে বিচ্ছিন্নভাবে, মূলতঃ খণ্ড খণ্ড স্বার্থপর লক্ষ্যকে সামনে রেখে। এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় কোনো বৈশ্বিক স্বপ্নকে সামনে রেখে এই পরিবর্তন আসছে না। নতুন একটা প্রযুক্তি আসলে আমরা উচ্ছ্বসিত হই, ইস্! এটাকে যদি সকল মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় পরিবর্তন আনার কাজে লাগানো যেত, যদি দারিদ্রমোচনের কাজে লাগানো যেত, যদি পরিবেশ রক্ষার কাজে লাগানো যেত। কিছু চেষ্টাও হয় এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে। কিন্তু বেশিদূর এগুনো যায় না। সবার চোখে স্বার্থপরতার চশমা লাগানো। এই চশমা ভেদ করে স্বার্থহীন উদ্দেশ্য সাধনে বেশিদূর যাওয়া যায় না- কারণ এই চশমা দিয়ে স্বার্থহীনতার রাস্তায় বেশিদূর দেখা যায় না। নব-আবিষ্কৃত প্রযুক্তির বাণিজ্যিক ব্যবহার নিয়ে সবাই এত ব্যস্ত থাকে যে অন্য ব্যবহারের কথা মনেই আসে না। স্বার্থহীন লক্ষ্যকে সামনে রেখে তার জন্য আনকোড়া নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করার জন্য কাউকে পাওয়া যায় না। সৃজনশীলতা আর্থিক সাফল্যের রাজপথ ধরে চলতে থাকে। এই পথে এমন কোনো পথ-নির্দেশ দেওয়া থাকে না যার থেকে জানা যাবে প্রযুক্তিকে কোন পথে নিয়ে গেলে সকল সমস্যামুক্ত নতুন এক পৃথিবী গড়া যাবে। তার চাইতে বড় কথা পথ-নির্দেশ স্থাপন করবে কে? কারা ঠিক করছে আমাদের গন্তব্য কোথায়?

মানুষ হিসেবে আমাদের সম্মিলিত গন্তব্য কোথায় এটা কি আমরা স্থির করে রেখেছি? যদি সেটা স্থির করা না-থাকে তবে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে যার যার পথে এগুবো, এটাইতো স্বাভাবিক এবং তাই হচ্ছে। তাই বিপদ আমাদের পিছু ছাড়ছে না। জাতিসংঘ প্রণীত শতাব্দীর উন্নয়ন লক্ষ্য ছিল একটা সুনির্দিষ্ট গন্তব্য। তাই এটা সবার মনে আশার সঞ্চার করেছে। ২০০০ সাল থেকে পরবর্তী ১৫ বছরের মধ্যে মানবসমাজ হিসেবে আমরা কোথায় পৌঁছাতে চাই এটা ছিল

তার একটা চমৎকার দিক-নির্দেশনা। এর কারণে আমরা অনেক সাফল্য অর্জনও করেছি। কিন্তু প্রযুক্তি এর পেছনে এসে দাঁড়ায়নি। জানা প্রযুক্তিকে আমরা এর জন্য মাঝে মাঝে ব্যবহার করেছি, কিন্তু এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তি সৃষ্টি করার কথা ভাবতে পারিনি। কারণ প্রযুক্তির জগত চলছে স্বার্থপর অর্থনীতির কড়া শাসনে।

> জাতিসংঘ প্রণীত শতাব্দীর উন্নয়ন লক্ষ্য ছিল একটা সুনির্দিষ্ট গন্তব্য। তাই এটা সবার মনে আশার সঞ্চার করেছে। ২০০০ সাল থেকে পরবর্তী ১৫ বছরের মধ্যে মানবসমাজ হিসেবে আমরা কোথায় পৌঁছাতে চাই এটা ছিল তার একটা চমৎকার দিক-নির্দেশনা

শিক্ষা-ব্যবস্থা

শিক্ষা-ব্যবস্থাকে মূল অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে গড়ে তোলা হয়েছে বিশ্বজুড়ে। শিক্ষার মূললক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থনীতির যন্ত্রটাকে সচল রাখার জন্য প্রশিক্ষিত কর্মচারী গোষ্ঠী তৈরি করা। শিক্ষা সমাপ্তির পর প্রত্যেকে একটি চাকরি পেয়ে গেলে শিক্ষার মূললক্ষ্য অর্জন হয়েছে বলে গণ্য করা হয়। শিক্ষা সমাপ্তির পর একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চাকরি না-পেলে নেমে আসে বেকারত্বের দুর্ভোগ।

এরকম একটা অনুচ্চারিত অথচ শক্তিশালী লক্ষ্যকে ভিত্তি করে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তা যুগে যুগে সৃজনশীল তরুণ-সমাজকে স্বার্থপর ক্ষুদ্র চিন্তার গণ্ডিতে আবদ্ধ করে রেখেছে। তারমধ্যে প্রচলিত পৃথিবীকে গ্রহণ করার মানসিকতাকে দৃঢ়ভাবে পুঁতে দেয়া হয়েছে। তাকে অন্যের হুকুম মানার জন্য তৈরি করা হয়েছে। কর্মস্থলের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার মানসিকতায় তাকে দীক্ষা দেয়া হয়েছে।

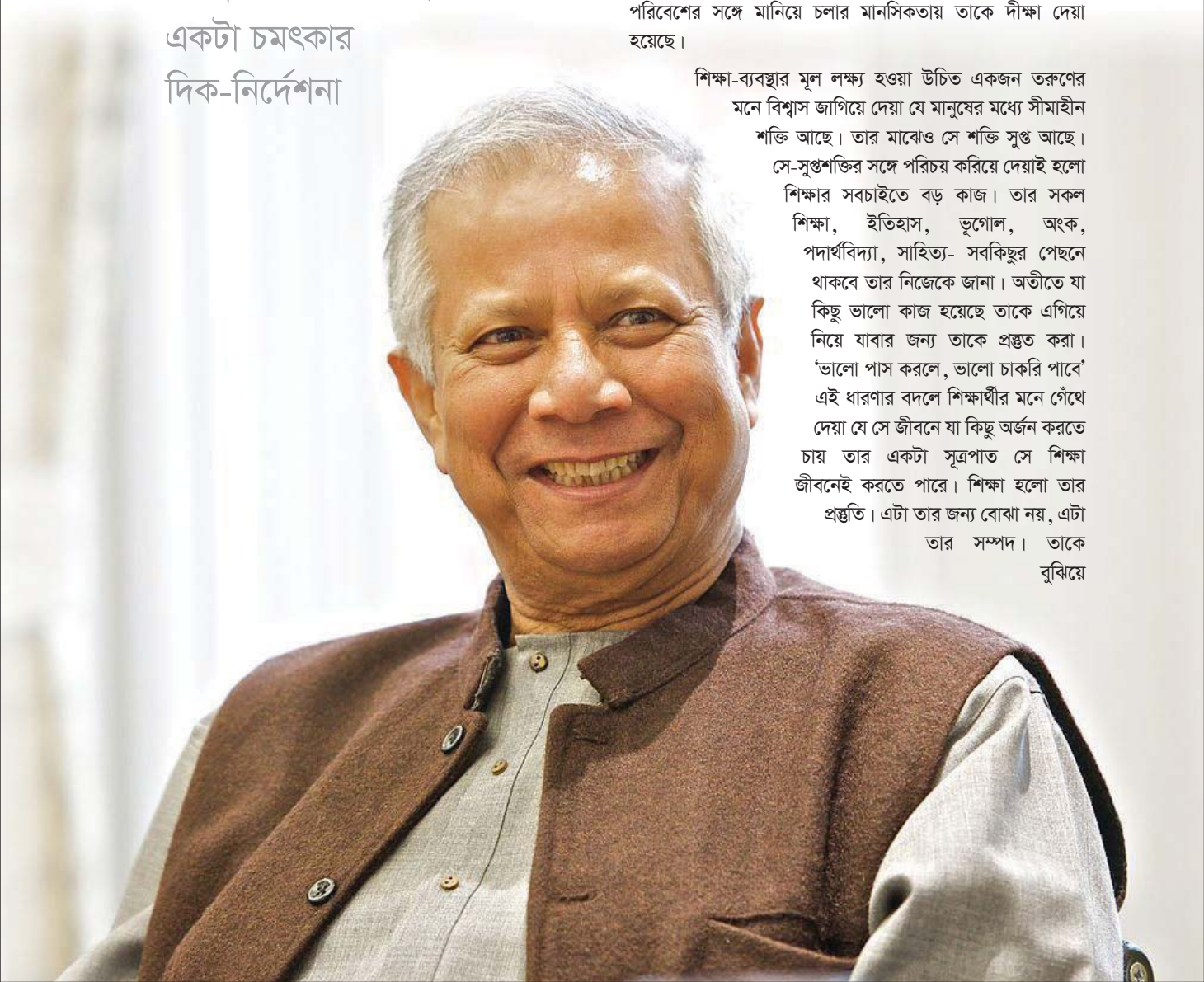

শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত একজন তরুণের মনে বিশ্বাস জাগিয়ে দেয়া যে মানুষের মধ্যে সীমাহীন শক্তি আছে। তার মাঝেও সে শক্তি সুপ্ত আছে। সে-সুপ্তশক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়াই হলো শিক্ষার সবচাইতে বড় কাজ। তার সকল শিক্ষা, ইতিহাস, ভূগোল, অংক, পদার্থবিদ্যা, সাহিত্য- সবকিছুর পেছনে থাকবে তার নিজেকে জানা। অতীতে যা কিছু ভালো কাজ হয়েছে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তাকে প্রস্তুত করা। 'ভালো পাস করলে, ভালো চাকরি পাবে' এই ধারণার বদলে শিক্ষার্থীর মনে গেঁথে দেয়া যে সে জীবনে যা কিছু অর্জন করতে চায় তার একটা সূত্রপাত সে শিক্ষা জীবনেই করতে পারে। শিক্ষা হলো তার প্রস্তুতি। এটা তার জন্য বোঝা নয়, এটা তার সম্পদ। তাকে বুঝিয়ে

> রাষ্ট্রনির্ভরশীল একজন মানুষের জন্য রাষ্ট্রকে ঐ ব্যক্তির পেছনে তার সারাজীবনে যে ব্যয় করতে হয় তার একটি ভগ্নাংশ তাকে পুঁজি হিসেবে দিলেই সে কিন্তু স্থায়ীভাবে শুধু নির্ভরশীলতা থেকে বের হয়েই আসবে না সে আরও মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে

দেয়া যে, তার সামনে একটি নয়, দুটি পথ খোলা। সে যেন বিশ্বাস করে যে- আমি চাকরি প্রার্থী নই, আমি চাকরিদাতা। চাকরিদাতা হিসেবে সে যেন প্রস্তুতি নিতে থাকে। তার বিদ্যায়তনের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা যারা চাকরিদাতা হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করে দেয়া। তাকে বুঝতে দেয়া যে সকল মানুষই উদ্যোক্তা। এটা তার সহজাত ক্ষমতা। সাময়িকভাবে সে চাকরি করতে পারে কিন্তু এটা তার কপালের লিখন মনে করার কোন কারণ নেই। একবার কর্মচারী হলে, একবার শ্রমিক হলে তাকে সারাজীবন কর্মচারী বা শ্রমিক হিসেবে কাটাতে হবে এমন কোনো ধারণা যেন তাকে দেয়া না হয়। তাকে নিজের শক্তির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে। শিক্ষা-ব্যবস্থার আরেকটা কাজ হলো প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পৃথিবী গড়ার কাজে উদ্বুদ্ধ করা। তাকে বুঝিয়ে দেয়া যে বর্তমান পৃথিবীটা হচ্ছে অতীতে যারা ছিল, এবং বর্তমানে যারা আছে তাদের হাতে গড়া একটা বাস্তবতা। এই বাস্তবতায় যা যা দোষ-ত্রুটি আছে সেগুলি উঠতি প্রজন্মকে সংশোধন করতে হবে, এবং তা সংশোধনের জন্য তাদের প্রস্তুতি নেয়ার সময়টাই হলো শিক্ষাকালীন সময়। এই সময়ের মধ্যে তাদেরকে নতুনভাবে আরেকটা পৃথিবী গড়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। নতুন গড়ার ক্ষমতা তাদেরই হাতে। কিন্তু তাদেরকে প্রস্তুত হতে হবে কোন ধরনের পৃথিবী তারা গড়তে চায় তার রূপরেখা তৈরি করার জন্য। প্রতিবছর প্রতিশ্রেণিতে তারা এককভাবে এবং সম্মিলিতভাবে নতুন পৃথিবীর রূপরেখা তৈরি করবে। পরের বছর সেটা পরিবর্তন, পরিবর্ধন করবে। শিক্ষা সমাপনের আগেই আগামী পৃথিবীর একটা ছবি তার মাথার মধ্যে যেন স্থান করে নিতে পারে। একবার এই ধারণাটা মাথায় স্থান করে নিলে ভবিষ্যৎ জীবনে তার কাজের মধ্যেও এটা প্রতিফলিত হতে আরম্ভ করবে। মানুষ হিসেবে আমাদের গন্তব্য সম্বন্ধেও তার একটা ধারণা সৃষ্টি হয়ে যাবে।

বেকারত্ব

বেকারত্ব মানে কী? পরিপূর্ণভাবে সক্ষম, কর্মের প্রতি আগ্রহশীল একজন মানুষ কোনো কাজ না-করে দিনের পর দিন সময় কাঠিয়ে যাওয়া- এটাই হলো বেকারত্ব। মানুষ কাজ করতে চায়, তার কাজ করার ক্ষমতা আছে, তবু সে কাজ করতে পারে না কেন? আমাদের অর্থনৈতিক যন্ত্রটা এমনভাবে বানানো যে এতে অনেকের জায়গা হয় না- তাই তাদেরকে বসে বসে সময় কাটাতে হয়। তাহলে এটা কি মানুষের দোষ, না যন্ত্রের দোষ। অবশ্যই যন্ত্রের দোষ। আমরা কি কোনোদিন জিজ্ঞেস করেছি যন্ত্রের দোষে মানুষ কেন শাস্তি পাবে? কেন একজন কর্মক্ষম সৃজনশীল মানুষ এক অদৃশ্য শৃঙ্খলে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জীবন কাটাতে বাধ্য হবে? এটা যদি যন্ত্রের দোষ হয় তাহলে এই যন্ত্র যারা বানিয়েছে তাদেরকে আমরা শাস্তি দিচ্ছি না কেন? আমরাই বা নতুন যন্ত্র বানাচ্ছি না কেন? যে-মানুষ মঙ্গল গ্রহে বাসস্থান নির্মাণের চিন্তায় মশগুল হতে পারে, সে মানুষ একটা উদ্ভট যন্ত্রকে বাতিল করে নতুন একটা যন্ত্র বানাতে পারছে না কেন?

পুরো জিনিসটার পেছনে আছে বর্তমান যন্ত্রের কারণে সৃষ্ট মানুষের প্রতি মানুষের বাধ্যতামূলক ঔদাসীন্য। পৃথিবীতে দু'চার জন লোক নয়, কোটি কোটি লোক বছরের পর বছর বেকার। আমরা শুধু ব্যাখ্যার জাল বুনে দায়িত্ব সমাপন করে যাচ্ছি। যে অমূল্য সম্পদের আমরা অপচয় করছি, মানুষের জন্য যে সীমাহীন যন্ত্রণার সৃষ্টি করছি তা নিয়ে কারো কোনো দুশ্চিন্তা আছে বলে মনে হয় না।

এক্ষেত্রে আমরা দু'টো পন্থায় সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করলে এর চাইতে আরও ভালো সমাধান অন্যদের কাছ থেকে আসবে এবিষয়ে আমি নিশ্চিত। একটা হলো, এখন বহুল পরিচিত ক্ষুদ্র ঋণব্যবস্থা। গ্রামীণ ব্যাংক এটার জন্মদাতা। সারা পৃথিবী জুড়ে এখন এবিষয়ে একটা সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রথম স্তরে স্বকর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা হয়। মহিলাদের মধ্যে এটা বিরাট পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে। স্বকর্ম সৃষ্টি বেকারত্ব অবসানের প্রথম ধাপ। কারো কাছে চাকরিপ্রার্থী হবার দরকার কী, আমি নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করব। এর জন্য শুধু পুঁজি দরকার। ব্যাংক ঋণ দিয়ে ব্যবসা শুরু করব।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো সামাজিক ব্যবসা তহবিল গঠন। এটাও অর্থায়নের একটা পদ্ধতি। গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ দেয়, সামাজিক ব্যবসা তহবিল বিনিয়োগে অংশীদার হয়, ঋণ দেয়, অন্যান্য পন্থায় অর্থায়নের ব্যবস্থা করে। একবার ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের অবস্থান থেকে সরে আসলে কাজটা খুব সহজ হয়ে যায়। সামাজিক ব্যবসা তহবিলের পক্ষ থেকে একজন বেকারকে বলা হচ্ছে, "তুমি ব্যবসায় নামো, ব্যবসার বুদ্ধি নিয়ে আমাদের কাছে আসো। আমরা তোমার ব্যবসায় পুঁজি দেব। যত টাকা লাগে আমরা বিনিয়োগ করব, তুমি ব্যবসা চালাবে। ব্যবসার মুনাফা থেকে আমাদের পুঁজি আমাদেরকে ফেরত দিয়ে তুমি পুরো মালিকানাটা নিয়ে নেবে।" যেহেতু এটা সামাজিক ব্যবসা তহবিলের টাকা সেহেতু এখানে কারো ব্যক্তিগত মুনাফার কোনো লোভ নেই। শুধু তহবিলের টাকাটা তহবিলকে ফেরত দিলেই হবে।

বেকারত্ব সৃষ্টির মূল কারণ দু'টি: শিক্ষা-ব্যবস্থা; যেখানে চাকরিই একমাত্র ভবিষ্যৎ, এরকম একটা ধারণার সৃষ্টি করা হচ্ছে। আরেকটি হলো ব্যাংকিং বা অর্থায়ন ব্যবস্থা। ব্যবসা করতে গেলে পুঁজি লাগে। বেকারকে বা গরিবকে পুঁজি দেবার জন্য কেউ অর্থায়ন ব্যবস্থা সৃষ্টি করেনি, যেহেতু মুনাফা অর্জনের জন্য এরচাইতে আরও বহু আকর্ষণীয় বিকল্প চারদিকে ছড়ানো আছে। সামাজিক ব্যবসা এটা অনায়াসে করতে পারে, যেহেতু এখানে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের কোনো শর্ত নেই। এইটুকু পরিবর্তন হলে বেকারত্বহীন পৃথিবীর সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। বেকারত্ব মানুষের কোনো ব্যাধি নয়। এটা অর্থনৈতিক শাস্ত্রকারদের ভুলের জন্য সৃষ্ট সমস্যা।

অর্থনীতি শাস্ত্রের মধ্যে এমন কোনো কথা জায়গা পাবার কথা নয়, যেটা মানুষের উদ্যমকে নিরুৎসাহিত করতে পারে। অর্থনীতি শাস্ত্রের মূল কাজ হবে মানুষের শক্তির স্ফুরণের জন্য পথ খুলে দেয়া, মানুষকে ক্রমাগতভাবে অধিকতর বড় মাপের হবার জন্য আয়োজন করে দেয়া। কিন্তু এখন হচ্ছে তার ঠিক উল্টো। আমরা এমন শাস্ত্র বানিয়েছি যেখানে বিশাল মাপের প্রকৃত মানুষকে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছি। হাতি দিয়ে আমরা মাছি তাড়ানোর কাজ করাচ্ছি।

রাষ্ট্রের উপর স্থায়ী নির্ভরশীলতা

রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো সংকটাপন্ন নাগরিকদের আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকায় সাহায্য করা। উন্নত বিশ্বে এই দায়িত্ব পালন করা হয় আয়হীন এবং স্বল্পআয়ের মানুষকে মাসিক ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়ে। কিন্তু রাষ্ট্রের আরেকটি প্রধান দায়িত্বের কথা আমরা এ প্রসঙ্গে ভুলে থাকি। এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটা হলো প্রত্যেক নাগরিকের জন্য তার শক্তি বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া। এই সুযোগ সৃষ্টির ব্যাপারে যদি রাষ্ট্র দায়িত্ব পালনে উদ্যোগী হতো এবং সফল হতো তবে কোনো নাগরিককে স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকার প্রয়োজন হতো না। এখন বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশে কিছু নাগরিক যে সারাজীবন কাটিয়ে দিচ্ছে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীলতার মধ্যে, শুধু তাই-নয়, বংশানুক্রমে এই নির্ভরশীলতা থেকে বের হতে পারছে না বা চাচ্ছে না। এর কারণ রাষ্ট্র এদেরকে নির্ভরশীলতার আওতায় আনতে অতিশয় তৎপর বটে, কিন্তু এদেরকে নির্ভরশীলতার আওতা থেকে বের করে আনতে তার কোনো উৎসাহ দেখা যায় না। বেকারত্বের মতো এটাও মানুষের তৈরি একটা কৃত্রিম সমস্যা। বেকারত্ব থেকে মানুষকে বের করার পদ্ধতি বের করতে পারলেই একই পদ্ধতিতে ভাগ্যহীন মানুষের জন্য নতুন ভাগ্য সৃষ্টি করে তাদেরকে রাষ্ট্র নির্ভরশীলতার আওতা থেকে বের হয়ে আসার সুযোগ দেয়া যায়। রাষ্ট্রনির্ভরশীল একজন মানুষের জন্য রাষ্ট্রকে ঐ ব্যক্তির পেছনে তার সারাজীবনে যে ব্যয় করতে হয় তার একটি ভগ্নাংশ তাকে পুঁজি হিসেবে দিলেই সে কিন্তু স্থায়ীভাবে শুধু নির্ভরশীলতা থেকে বের হয়েই আসবে না সে আরও মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে, তার পরবর্তী বংশধরকে রাষ্ট্রের নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত রাখবে, এবং সে নিজে করদাতা হিসেবে রাষ্ট্রের কোষাগারে অর্থযোগান দেবে।

তাহলে এটা রাষ্ট্র করে না কেন? কারণ রাষ্ট্রকে শাস্ত্রকাররা বুঝিয়ে দিয়েছে যে এদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করতে না-পারা পর্যন্ত তাদেরকে খাইয়ে পরিয়ে রাখতে হবে। চাকরি ছাড়া গতি নেই, এই যে মন্ত্র শাস্ত্রকাররা আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে এর থেকে আমরা বের হতে পারছি না। মানুষকে উদ্যোক্তা হিসেবে দেখতে আমাদের মনে অনীহা জমে গেছে।

কথাটা স্পষ্ট করার জন্য বলে রাখি, কারো মনে এমন কোনো ধারণার যেন জন্ম না নেয় যে রাষ্ট্রের সহায়তায় যারা জীবন ধারণ করেন তাদেরকে আমি তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চাইছি। মোটেই তা চাচ্ছি না। আমি শুধু তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিদের কথা বলছি যারা আগ্রহ করে, দরখাস্ত করে, রাষ্ট্রের নির্ভরশীলতা ছেড়ে এসে নিজের আয়ে নিজে চলতে চান, তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টির কথা বলছি। যারা এখন যেভাবে আছেন সেভাবে থাকতে চান তারা সেভাবে থাকবেন। নিজের আয়ে নিজে চলার বিষয়টি যাতে সকলের কাছে আকর্ষণীয় এবং বাস্তবসম্মত করা যায় তার জন্য রাষ্ট্রকে সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে, কারণ মানুষের জীবন পরনির্ভরশীলতার জীবন হতে পারে না। মানুষ কর্মঠ জীব। সৃজনশীল জীব। মানুষের প্রকৃতিই হলো নিরন্তর নিজেকে বিকশিত করা, নিজের সম্ভাবনার সীমারেখাকে ক্রমাগতভাবে সম্প্রসারিত করা। অলস জীবন মানুষের স্বাভাবিকত্বকে কেড়ে নেয়। পরনির্ভরশীলতা মানুষকে ক্ষুদ্র করে। তাই বেকারত্ব ও দারিদ্র এত অসহনীয়।

উপসংহার

প্রচলিত পুঁজিবাদী শাস্ত্র পৃথিবীর মৌলিক সমস্যা থেকে আমাদের মুক্তি দিতে পারবে না। এই কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে অগ্রসর হলে আমাদের সমস্যাগুলির সামাধান তো হবেই না, বরং এগুলি জটিলতর হয়ে আরও সমস্যার সৃষ্টি করবে। বড়মাপের প্রকৃত মানুষকে ছোট আকারের রোবট-প্রায় মানুষে পরিণত করে অর্থনীতি শাস্ত্র এ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। প্রকৃত মানুষকে তার স্বাভাবিক সত্তাগুলি প্রকাশ করার সুযোগ দিলে বর্তমানে সৃষ্ট সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। মানুষের স্বার্থহীনতাকে অর্থনীতিতে স্বীকৃতি দিতে হবে। সামাজিক ব্যবসাকে শাস্ত্রীয় স্বীকৃতির মাধ্যমে এই উদ্যোগ শুরু হতে পারে। সামাজিক ব্যবসাকে স্বীকৃতি দিলে অর্থনীতিতে এটা কি কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় যেতে পারবে, নাকি একটা ক্ষুদ্র নামকাওয়াস্ত কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে, এ নিয়ে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। মানুষের মধ্যে যে স্বার্থহীনতা এবং সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য কাজ করার যে প্রচণ্ড আগ্রহ ও ক্ষমতা তা দেখলে মনে হয় একবার সামাজিক ব্যবসা ব্যাপক পরিচিতি লাভ করলে এটা মহাশক্তিতে পরিণত হতে পারে। স্বার্থপরতা ও স্বার্থহীনতার দ্বন্দ্বে স্বার্থহীনতা অগ্রগামী হবে বলে আমার বিশ্বাস। নতুন প্রজন্মের তরুণদের দেখলে, বর্তমান সমাজ ও অর্থনীতি নিয়ে তাদের হতাশার কথা শুনলে আমার এধারণা আরও বদ্ধমূল হয়।

নতুন পৃথিবী সৃষ্টির সময় এসেছে। প্রযুক্তি আমাদেরকে এই সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। আমাদেরকে পথ বের করতেই হবে। সামাজিক ব্যবসা আমাদের মনে আশা জাগায়। হয়ত সামাজিক ব্যবসা আমাদেরকে গন্তব্যে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। এই গন্তব্য হবে সবার জন্য ঋণ, সবার জন্য পুঁজি, সবার জন্য স্বাস্থ্য, সবার জন্য প্রযুক্তি, সবার জন্য সুশাসন, বেকারত্বহীন, দারিদ্রহীন, পরিবেশ দুষণমুক্ত , যুদ্ধাস্ত্রমুক্ত, শান্তিপূর্ণ, আয়ের বৈষম্যহীন এক নতুন পৃথিবী।

লেখক: মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নজরুলের নন্দনতত্ত্ব

কুদরত-ই-হুদা

কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৯৯ সালে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে। বাংলাভাষী মানুষ, কবি নজরুল বলতে যে-নজরুলকে সাধারণভাবে বুঝে থাকেন, সেই নজরুলের আত্মপ্রকাশ ঘটে এই ১৯২২ সালে। তখন তাঁর বয়স তেইশ বছর। তেইশ বছর বয়সী এই কবির আবির্ভাব বাংলা কাব্যজগতে বেশ একটা অস্বস্তি তৈরি করে। এই অস্বস্তির কারণ কেবল তাঁর কবিতা নয়, স্বয়ং তাঁর কবিতার নন্দনতত্ত্ব। এতকাল বাঙালি কাব্যপাঠক কবিতা বলতে যা বুঝতেন, সেই ধারণার সঙ্গে নজরুলের কবিতা ঠিক খাপ খাচ্ছিল না- না বিষয়গত দিক থেকে, না প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে। 'আধুনিক' বাংলা কবিতার প্রায় পৌনে এক শতাব্দীর যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসের ধারাবাহিকতা নজরুলের কবিতা রক্ষা করেনি। এ-কারণে কবিতা মাপার যে মাপকাঠিটি এতদিন চালু ছিল, সেটি প্রায় অকার্যকর হয়ে যায় নজরুলের ক্ষেত্রে। আবার তাঁর কাব্যবিচারের জন্য তখনও কেউ প্রস্তাব করতে পারেননি নতুন কোনো নন্দনতত্ত্ব। নজরুলের যে কাব্যসাধনা, তা নিঃসন্দেহে দাবি করে এক নতুন নন্দনতত্ত্বের প্রস্তাবনা। কিন্তু নজরুলের সমকালীন এবং পরকালীন অধিকাংশ নজরুল-সমালোচকই নতুন নন্দনতত্ত্বের প্রস্তাবনায় যাননি। তাঁরা অধিকাংশ সময় নজরুলকে প্রথাগত নন্দনতত্ত্বের মাপকাঠিতে মেপে হয় তাঁকে খাটো

তাঁর কাব্যবিচারের নন্দনতত্ত্ব সৌন্দর্য ও আনন্দ-সৃজননির্ভর 'আধুনিক' নন্দনতত্ত্বের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে এতে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলা ভাষা যে এত ধারালো তা-তো নজরুলই আবিষ্কার করলেন। সাহিত্য যে প্রতিরোধের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে তাঁর উদাহরণও প্রতিষ্ঠা করলেন নজরুল

করেছেন, নয়তো বলেছেন- নজরুল বাংলা কাব্যে এক নতুন সুর ও স্বরের বার্তা ধ্বনিত করেছেন। নজরুল-পাঠের জন্য নতুন নন্দনতত্ত্বের প্রস্তাবনা হাজির করার দুঃসাধ্য সাধনার পথে অধিকাংশ সমালোচকই যাননি।

নজরুল-মূল্যায়ন করতে গিয়ে প্রায় সব সমালোচকই 'আধুনিক' বাংলা কাব্য-বিবেচনার যে-মাপকাঠি বা নন্দনতত্ত্ব তাকেই প্রয়োগ করেছেন। এই 'আধুনিক' নন্দনতত্ত্বের ধারণা উপনিবেশের হাত ধরে বাংলায় প্রবেশ করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি 'পশ্চিমী আধুনিক' সাহিত্যের রুচি ও চেতনা নিয়ে বাংলা সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। ফলে এর নন্দনতত্ত্বও ইউরোপ থেকে আসবে এটাই স্বভাবিক। এই নন্দনতত্ত্বের প্রধান শর্তই হচ্ছে সাহিত্যকে বিশুদ্ধ শিল্প হিসেবে বিবেচনা করা। শৈল্পিক সুষমা তৈরি, মানসিক আনন্দ প্রদান আর মহৎ মনের প্রতিফলন ঘটানোই সাহিত্য-বিবেচনার এবং সাহিত্য রচনার মৌল উদ্দেশ্য। বুর্জোয়া জীবনের ফিটফাট 'আধুনিক' বুর্জোয়া সাহিত্যের শর্ত হবে এটাই স্বাভাবিক। 'আধুনিক' নন্দনতত্ত্বের এই ধারণার মধ্য দিয়েই উপনিবেশ-পরবর্তী সময়ের বাংলা সাহিত্য এবং সাহিত্য-সমালোচনা বেড়ে উঠেছে। ফলে, এই প্রথাগত 'আধুনিক' নন্দনতত্ত্বের মাপকাঠি যখনই নজরুলের মূলধারার কাব্য-কবিতার মধ্যে চারিয়ে দিয়েছেন, তখনই তাঁরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছেন যে, নজরুলের কাব্য-সাহিত্য সেই মানদণ্ডের একদম নিচে পড়ে থাকে। এরকম কাজ অনেকেই করেছেন। কাজী আবদুল ওদুদ, বুদ্ধদেব বসু, এমন কি হালের হুমায়ুন আজাদ। ওদুদ ১৯৪১ লিখিত তাঁর 'নজরুল ইসলাম' শিরোনামের প্রবন্ধে নজরুলকে 'আধুনিক' নন্দনতত্ত্বের মাপকাঠিতে দেখে বললেন- 'নজরুলের কবিতায় যে-তারুণ্য রূপ পেয়েছে তার সাহিত্যিক মর্যাদা কেমন সেটিও একটি বড় অনুধাবনের বিষয়। একটু মনোযোগী হলেই চোখে পড়ে, নজরুলের রচনা, বিশেষ করে তাঁর বিদ্রোহীযুগের রচনা অনবদ্য নয়। শ্রেষ্ঠ কবিদের বিশেষ বিশেষ কবিতায় কবি-কল্পনার যে পূর্ণাঙ্গতা প্রকাশ পায় নজরুলের রচনায় সেটির অভাব মাঝে মাঝে প্রায় বেদনাদায়ক হয়েছে।' নজরুলের মধ্যে ওদুদ বুর্জোয়া ফিটফাটের খোঁজ করেছেন। ওদুদ নজরুলের কবিতায় মূলত রবীন্দ্রনাথকে খুঁজেছেন। নজরুলের আলোচনা করতে গিয়ে, নজরুল-বিষয়ক তাঁর লেখা তিনটি প্রবন্ধেই তিনি বারবার মহৎ কবির উদাহরণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ টেনেছেন। বারবার তিনি নজরুলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে না পেয়ে হতাশ হয়েছেন। অনেকে এজন্য ওদুদকে দোষারোপ করে থাকেন। যেমন, আব্দুল মান্নান সৈয়দ তাঁর 'নজরুল: কালজ কালোত্তর' গ্রন্থে ওদুদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এটি ওদুদের সমস্যা নয়। এটি মূলত নন্দনতত্ত্বের সমস্যা; মাপকাঠির সমস্যা। ওদুদ সুকুমারী কুসমলতিকায় কাঁঠাল প্রাপ্তির আশা করেছেন। আর সে-আশায় সঙ্গত কারণেই নিরাশা-ই সার হয়েছে। ওদুদ-ঘরানা ছাড়াও নজরুলের আরও এক ধরনের মূল্যায়ন চালু আছে। সেটিকে আমরা বলতে পারি দায়হীন মূল্যায়ন। এই মূল্যায়ন নজরুলের নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যায়নের দায়িত্ব নেয় না; বরং নজরুলের স্বর ও সুরের ভিন্নতা বিষয়ে উচ্ছ্বসিত হয়, কিন্তু সেই ভিন্নতার সুনির্দিষ্ট রূপরেখা নির্মাণ করে না। নজরুলের জন্য যে ভিন্ন কাব্যপাঠ-ব্যাকরণের প্রয়োজন, সেই ব্যাকরণিক সূত্র নির্দেশ করে না। অথচ ভিন্ন নন্দনতত্ত্বের প্রস্তাবনা ছাড়া নজরুলকে সম্যকভাবে পাঠ সম্ভব নয়। নজরুলের সেই নন্দনতত্ত্বটি কী- নজরুলের নিজের ভাষ্য এবং তাঁর কাব্যপ্রবণতা পর্যালোচনা করে তার একটি রূপরেখা হাজির করা যেতে পারে।

নজরুল সাহিত্যকে আনন্দ আর সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্র মনে করতেন না। বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব হয়েছে 'উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল' বন্ধ করার দায়িত্ব নিয়ে। নজরুলের আগের প্রায় পৌনে এক শতাব্দীর কাব্য তার মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠীর মর্মে পশ্চিম থেকে আগত রোমান্টিক আনন্দ-বেদনা আবিষ্কারের ও প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিল। ওই কবিতা তার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর গ্লানিময় ইতিহাসকে, অবমাননাকে রুখে দেওয়ার দায়িত্ব নেয়নি। দায়িত্ব নিয়েছিল ইউরোপীয় নতুন ভাব-কল্পনাকে ভাষা দেয়ার। এ-কারণে এসব কবিকে আবিষ্কার করতে হয়েছিল বাংলা শব্দের ছদ্মাবরণে ইউরোপীয় অর্থে মার্জিত ভাষাকাঠামো। কিন্তু নজরুল তো সে-পথের পথিক ছিলেন না। দীর্ঘকাল থেকে জমে ওঠা জঞ্জাল সাফ করতে যেমন বহুমানুষের সমবায়ী প্রচেষ্টা দরকার হয়, নজরুল তেমনি বহুমানুষের মুখের ভাষাকে আশ্রয় করে, বহুমানুষের হৈ-হল্লা আর কোলাহল-মুখরিত এক কাব্যভুবন নির্মাণ করেছেন। নজরুলের

কবিতা মানেই বহুমানুষের শোরগোল, অসভ্য-অমার্জিত অট্টহাস্য, ধসে পড়ার শব্দ, আসুরিক চিৎকার। সর্বৈব ধ্বংস আর সম্মিলিত প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে নতুন কিছু সৃজনের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে যিনি কাব্যরচনা করেছেন। তাঁর কাব্যবিচারের নন্দনতত্ত্ব সৌন্দর্য ও আনন্দ-সৃজননির্ভর 'আধুনিক' নন্দনতত্ত্বের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে এতে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলা ভাষা যে এত ধারালো তা-তো নজরুলই আবিষ্কার করলেন। সাহিত্য যে প্রতিরোধের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে তাঁর উদাহরণও প্রতিষ্ঠা করলেন নজরুল।

নজরুলের স্বতন্ত্র জীবনদৃষ্টি এবং সেই জীবনবোধের মধ্যকার প্রবল তীব্রতাই তাঁকে স্বতন্ত্র নন্দনতত্ত্বের পথের পথিক করেছে। 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছ জুয়া/ ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া'- এই বাকভঙ্গি এবং শব্দচয়নকে তো বাংলা গদ্য এবং কবিতা ঊনবিংশ শতাব্দীতেই কবর দিয়েছে। বাংলায় 'আধুনিকতা' যেমন এর জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক যাপনের ধারাবাহিকতায় দেখা দেয়নি, তেমনি বাংলা কাব্য-সাহিত্যও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সিদের হাতুড়ি-বাটাল দিয়ে গড়াপেটা করা একটা চাপানো ভাষার ভেতর দিয়ে বিকশিত হয়েছে। নজরুল সেই কাব্য এবং এর ভাষার মহান আদর্শকে হেঁচকা টানে সদর রাস্তায় নিয়ে আসলেন। নজরুল তাঁর কাব্যে আরবি-ফারসি শব্দের বহুল প্রয়োগ করেছেন- এটি নজরুলের ভাষাবিচারের ক্ষেত্রে আক্ষরিক কথা। কিন্তু ভাবার্থের কথা হচ্ছে, নজরুল ভাষাকে উদার, মুক্ত এবং গণতান্ত্রিক করে দিলেন; জনবিচ্ছিন্নতার কেটে যাওয়া সূত্র লাগিয়ে জনসম্পৃক্ত করলেন। আহমদ ছফা নজরুলের ভাষার মধ্যে এই জনসম্পৃক্তি লক্ষ্য করেই বলেছেন 'নজরুল তার কাব্যভাষা নির্মাণে চলতি ভাষারীতির...দ্বারস্থ হয়েছেন।' আর ভাষায় গণতান্ত্রিকতার বিষয়ে বলেছেন- 'নজরুলের কাছে সমগ্র বাঙালী সমাজের ঋণ এই যে, নজরুল বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যকে বাঙলার হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করে নব বিকাশধারায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে অনেকদূর পর্যন্ত গাঁথুনি নির্মাণ করেছিলেন।' এর মানে এই নয় যে, নজরুল সংস্কৃত শব্দকে তাঁর কাব্যভাষা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছেন। নজরুলের কাব্যভাষায় প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু ভাষার ভেতরের আকাশটাকে উদারীকরণ করে যে-সে-শব্দের প্রবেশ অনুমোদন দিয়ে এবং মৌখিক বাকভঙ্গি ব্যবহার করে নজরুল বাংলা কবিতা থেকে চোখ এবং কানের দূরত্বকে ঘুচিয়ে দিয়েছেন। ঔপনিবেশিক সাহিত্য কবিতাকে দৃষ্টি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছিল। কবিতার সঙ্গে শ্রুতির সম্পর্ক থেকে বিচ্যুত করেছিল। নজরুল সেই শ্রুতি ইন্দ্রিয়কে বাংলা কবিতায় ফিরিয়ে আনলেন। একারণে নজরুলের অনেক কবিতা পড়ার সময় সংস্কৃত শব্দের প্রচুরতা এক ধরনের কাঠিন্য তৈরি করলেও সেই কবিতা যখন কানের কাছে আসে, তখন তা বেশি বোধগম্য ও সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে ছন্দও এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে নজরুলের কবিতায়। দেখা যাবে, নজরুলের মূলধারার অধিকাংশ কবিতা স্বরবৃত্ত অথবা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এই ছন্দ গ্রহণের ক্ষেত্রে নজরুলের সঙ্গে আরেক গণসম্পৃক্ত কবি জসীম উদ্‌দীনের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। কবিতাকে সহজ ও গণগ্রাহ্য করে তোলার জন্য জসীম উদ্‌দীনও এই সহজবোধ্য ও আরামপাঠ্য স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পিঠে সওয়ার হয়েছিলেন। যদিও নজরুলের কাব্যে বিষয়ের ও ভাবের ওচড়-মোচড়ের কারণেই স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বৈচিত্র্য ও নিরীক্ষা অনেক বেশি, যা জসীম উদ্‌দীন-এ নেই। তবু অক্ষরবৃত্তের নানা নিরীক্ষা এবং তার প্রয়োগ উপেক্ষা করে নজরুল মধ্যযুগের পয়ারের মতোই বোধগম্য ও জনসম্পৃক্ত স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। নজরুলের স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত যোগাযোগ-সক্ষমতার প্রশ্নে মধ্যযুগের পয়ারের প্রতিনিধিত্ব করেছে। এভাবে নজরুল জীবনবোধ, উদ্দেশ্য, ভাষা, ছন্দ ইত্যাদির প্রশ্নে আধুনিক কাব্যধারার নন্দনতত্ত্বের বাইরে গিয়ে এক নতুন নন্দনতত্ত্বের সৃষ্টি করেছেন এবং তারই আওতার মধ্যে কাব্যচর্চা করেছেন।

নজরুল স্পষ্ট কথা বলার পক্ষের লোক। তিনি মনে করেন 'স্পষ্ট কথা বলায় একটি অবিনয় নিশ্চয় থাকে; কিন্তু তাতে কষ্ট পাওয়াটা দুর্বলতা।' বেশি বিনয় 'মানুষকে ক্রমেই ছোট করে ফেলে, মাথা নীচু করে আনে'- নজরুল এই বিনয়ের বিপক্ষের লোক ছিলেন। নজরুল মনে করতেন 'দেশের যারা শত্রু, দেশের যা-কিছু মিথ্যা, ভণ্ডামি, মেকি তা সব দূর করতে হবে।' এই কাজ কবির, এই কাজ নজরুলের। জীবনে এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে নজরুল 'মেকি'-র বিরুদ্ধে। নজরুল তাঁর নিজের লেখার ভেতরবাড়ির স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন- 'আমার লেখায় ফুটে উঠেছে সত্য, তেজ আর প্রাণ।' তিনি নিজেকে মনে করতেন 'সত্য প্রকাশের যন্ত্র।' 'অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস'-ই নজরুল-নন্দনতত্ত্বের অন্যতম নিয়ামক। এছাড়া 'যে ভাষা-শৃঙ্খলে আমাদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা, তাতেই আছে অসংখ্য নিয়ন্ত্রক কাঠামো-জ্ঞানের, শৃঙ্খলার সংযমের, সভ্যতার। এগুলোই আমাদের সংকোচে বিহ্বল করে রাখে। আমরা এগুলোকেই নির্মাণ-পুনর্নির্মাণ করতে থাকি, কদাচ ভেঙে তৈরি করি নতুন কাঠামো। জন্মসূত্রে, শিক্ষাসূত্রে, জীবনযাপনসূত্রে, আর মনের বিশিষ্ট গড়নের কারণে নজরুল নিয়ন্ত্রক-কাঠামোগুলোর বাইরে থেকেছেন।' (দেখুন; মোহম্মদ আজম, সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, ঢা.বি, বর্ষ-৫০, সংখ্যা-২-৩) উপর্যুক্ত জীবনচেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি, বেড়ে ওঠা, ঘোষণা এবং উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলা কবিতায় আর কেউ আবির্ভূত হননি। এসব কারণে নজরুলের নন্দনতত্ত্বের মধ্যে বহুমানুষের সমাগম এবং তাদের কল্যাণের মতো মাপকাঠি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জনবিচ্ছিন্ন, ব্যক্তিগত ভোগ-উপভোগের যে-সাহিত্যতত্ত্ব তার বদলে নজরুলে প্রযুক্ত হয়েছে সম্মিলিত ভোগ-উপভোগ এবং জাগরণের তত্ত্ব। নজরুলের নন্দনতাত্ত্বিক চেতনার মধ্যে নিছক সৌন্দর্যসৃষ্টি এবং তার খোঁজ বেশ খানিকটা অচল। ভাবে-ভাষায়-প্রকাশে নজরুলের নন্দনতত্ত্ব অকৃত্রিমতার পক্ষপাতী। বুর্জোয়া-জীবনের মতো সাহিত্যে বুর্জোয়া ফিটফাট নজরুলের নন্দনতত্ত্বের আওতায় সম্পূর্ণভাবে আঁটে না। এ-কারণেই নজরুলের কাব্যপ্রবাহ তৈরি করেছে উপনিবেশ-বিরোধী এক নতুন নন্দনতত্ত্ব। নজরুলের নন্দনতত্ত্বের এই ভিন্নতা লক্ষ্য করে আল মাহমুদ তাঁর 'কাজী নজরুল ইসলাম' প্রবন্ধে বলেছেন- 'র‍্যাঁবো যেমন গল জাতির কাব্যবিচার ও সৌন্দর্যতত্ত্বের ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি নজরুলও বাংলা ভাষাভাষী দ্রাবিড় ভেড্ডিড রক্তমিশ্রিত একটি বিরাট মানবগোষ্ঠীর প্রচলিত উপমা পদ্ধতির শৃঙ্খলাকে তোলপাড় করে দিয়েছিলেন।' আল মাহমুদ কথিত 'প্রচলিত উপমা পদ্ধতি'-ই হচ্ছে ঔপনিবেশিকতার হাত ধরে আসা ইউরোপীয় নন্দনতত্ত্ব। নজরুল এই ঔপনিবেশিক নন্দনতত্ত্বের বাইরে গিয়ে 'দ্রাবিড় ভেড্ডিড রক্তমিশ্রিত একটি বিরাট জনগোষ্ঠীর' জন্য তার নিজস্ব একটি নন্দনতত্ত্ব হাজির করেছেন যার নামকরণ করা যায় বাঙালিয়ানা নন্দনতত্ত্ব।

লেখক: উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

কবিতা

রবীন্দ্র গোপ

নজরুল হে বিপ্লবী মহান
আমার স্বপ্নে আমার ধ্যানে আমার বিপ্লবে
আমার সংগ্রামে
বারবার তুমি এসে দাঁড়াও বাবরিচুলের সমুদ্র ঢেউয়ে
আমার সকল অস্তিত্বে দোলা লাগে প্রাণে প্রাণে
জাগে আনন্দ হিল্লোলে
তুমি আমাদের ঘুমন্ত চেতনায়
জাগিয়ে দাও ভোরের রক্তিম সূর্যকে।

তুমি বিদ্রোহী বীর সত্য আর সুন্দরের
ধ্যানমগ্ন পুড়ে পুড়ে অঙ্গার হয়েছ,
সূর্যপোড়া ছাই থেকে বিপ্লবের মহামন্ত্রে
পবিত্র করেছ বিশ্বকে বুক টান করে দাঁড়িয়েছ
জগতের সকল লাঞ্ছিত-বঞ্চিত ভাগ্যহতদের সপক্ষে।

তুমি মানুষকে ভালোবেসে সবার উপরে দিয়েছ আসন গেয়েছ সাম্যের গান
অভেদ ধর্ম আর জাতির ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে
পৃথিবীর মানুষকে দেখিয়েছ সত্যের আলোকিত উজ্জ্বল পথ। তুমি
শিখিয়েছ মানুষেরে
যে মন্দিরের দরজা ভিখারিকে দেখে বন্ধ হয়
সে মন্দির পূজারীর, সেখানে দেবতা থাকে না
সে মন্দির দেবতার নয়, তুমিই বলেছ
মসজিদ মন্দিরে প্রভু নাই
প্রভু অন্তর্যামী অন্তরে বসবাস।

নজরুল হে কবি, হে বিপ্লবী মহান,
মানুষ মানুষেরে ভালোবেসে মানুষেতেই
মুক্তির পথ দেখিয়েছ তুমি, দেবতা আর ঈশ্বরে নয়
হে কবি তুমিই সত্য সুন্দরের পথপ্রদর্শক
হে কবি তুমিই মহান।

জাতীয় কবি

গোলাম নবী পান্না

ছোট্টবেলায় বাবা মারা যান অসহায় হন 'দুখু'
সংসারে তার হাল ধরা চাই বয়সটা ঐটুকু।

মনোবল যার দৃঢ় প্রত্যয় সাহস রয়েছে বুকে
এগোতে গেলেই বাধার পাহাড় পায়ে পায়ে যেন ঠুকে।

মসজিদে নেন ইমামতি ভার, 'চুরুলিয়া' হয় থাকা
ছকবাঁধা কোনো নিয়মে তাঁকে যায় না কখনো রাখা।

লেটোর দলে যোগ দিয়ে কবি হলেন সুরের পাখি
লিখে লিখে গান নিজে গেয়ে যান সুরের মাখামাখি।

ইশ্‌কুলে যত মিস্ করা হতো নিয়মের শত বালাই
ভাবখানা তার এমন ছিলো সুযোগ পেলে পালাই।

উচাটন মন সৃষ্টি কাজের দৃষ্টি যখন মেলে
সুখ-সাঁতারে তীর খুঁজে পান ঢেউয়ের বহর ঠেলে।

কবিও পারেন যুদ্ধে যেতে তাই 'সৈনিক' বেশে
কাব্য মুখে সাহস বুকে যোগ দিয়েছেন শেষে।

লেখায় আবার কবি নিজেকে ব্যস্ত রাখেন খুব
নব নব যত সৃষ্টি-খেলায় ভাবনায় দেন ডুব।

নতুন খেলার প্রতিপাদ্য গল্প-কবিতা-গান
স্বপ্ন-দুয়ার খোলা কবির লেখায় পৌঁছে যান।

একটানা যিনি লেখার দৌড়ে সৃষ্টি-রাজ্য পেলেন
'বাকরুদ্ধ' জীবন ঘিরে দারুণ হোঁচট খেলেন।

এগারো জ্যৈষ্ঠ জন্ম কবির বারোই ভাদ্র আবার
বাকরুদ্ধ জীবন শেষে পরপারে হলো যাবার।

'মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই'
কবির চাওয়া মর্মবাণী পূর্ণ হলো তাই।

দুখু নজরুল 'বিদ্রোহী কবি' 'জাতীয় কবি' আজ
এ জাতি তাঁকে ভালোবাসা মাখা পরালো যে নয়া তাজ।

বাংলার শরৎ

মো. শাহাদত হোসেন

নীল আকাশে সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায়। পেজা তুলোর মতো নরম নরম মেঘ। পুরো আকাশটা ছবি হয়ে যায়, জীবন্ত ছবি, চলন্ত ছবি। যেদিকেই তাকানো যাক না কেন, সেদিকেই চলে মেঘেদের খেলা। এই সাদা মেঘ, এই নীল আকাশ। কী এক অপরূপ দৃশ্য! স্বর্গীয় দৃশ্য! শুভ্রতার প্রতীক, নম্রতার প্রতীক, শান্তির প্রতীক। আসলে এ যে বাংলার শরৎ। বাংলাদেশ মানেই সৌন্দর্যের লীলাভূমি। এর মাঠে-ঘাটে অপরূপ দৃশ্য, আকাশে-বাতাসে অপরূপ খেলা। ষড়ঋতুর ভেলায় চড়ে নানা রূপ আর নানা প্রকৃতি এ দেশের মানুষকে নানাভাবে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। কোনো কোনো ঋতু আসে উত্তাল-উন্মত্ত হয়ে, কোনো কোনো ঋতু আসে অতি শান্তভাবে, সঙ্গোপনে।

বাংলাদেশ যখন তীব্র দাবদাহে পুড়তে থাকে, তখনই স্বস্তির বৃষ্টি এসে সবাইকে শান্ত করে দিয়ে যায়। আর যখন প্রবল বর্ষায় মাঠ-ঘাট ডুবে যায়, রাস্তা-ঘাট তলিয়ে যায়, তখনই শরৎ এসে সবাইকে চুপ করিয়ে দেয়। একটু গরম থাকলেও শরতের হিমেল হাওয়া আমাদের হৃদয়-মন জয় করে নেয়। কবি হাফেজ আহমেদ যেমনটি বলেছেন,

> ‘বিজলী তুফান বর্ষা শেষে
> ভাদ্র-আশ্বিন মাসে
> ডাঙার জলে ডিঙির উপর
> শরৎ রানী হাসে।’

গ্রীষ্ম ও বর্ষার পর, ভাদ্র আশ্বিন মাসে শরৎকাল। অর্থাৎ আগস্টের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত শরৎকাল। চুপিসারে এলেও সবার মন রাঙিয়ে দেয় এ ঋতু। কবিরা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন কবিতা লিখতে, প্রেমিক ব্যস্ত হয়ে ওঠেন প্রেমিকাকে কাছে পেতে। এ ঋতুতে শুধু আকাশে সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায় না, নদীর দু'কূলও ভরে

যায় সাদা সাদা রঙে। নতীর তীরে তীরে ফুটে কাশফুল। মৃদু হাওয়ায় কাশফুলের ঢেউখেলানো অপরূপ সৌন্দর্যে মন মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। কবিতা লিখতে আর ছবি আঁকতে মন আনচান করতে থাকে।

শরতের এ কাশফুলই জয়নুল আবেদীনকে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনে রূপান্তর করেছে। ছোটবেলায় তিনি ময়মনসিংহের পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের তীরে নৌকায় ঘুরে বেড়াতেন। শরতে চলে যেতেন কাশফুলের কাছে। একনাগারে চেয়ে চেয়ে দেখতেন সেই অপরূপ সাদা কাশফুল, হারিয়ে যেতেন কাশের বনে। নদী আর মানুষের ছবি আঁকতেন মনে মনে, তুলিতে আর কাগজে।

শুধু শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনকে নয়, শরৎ মোহিত করেছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও। তাইতো কবি বলেছেন, 'শরৎ তোমার শিশির-ধোওয়া কুন্তলে, বনের পথে লুটিয়ে-পড়া অঞ্চলে, আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি।' অন্যত্র কবিগুরু আরও আবেগঘনভাবে শরতের বন্দনা করেছেন। তিনি লিখেছেন,

আজি কি তোমার মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে!
হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।

বাংলার মানুষ যখন গ্রীষ্ম আর বর্ষার সাথে লড়াই করে ক্লান্ত, তখন শরৎ এসে সব শান্ত করে দেয়। দিনব্যাপী বৃষ্টি নেই, সোনালি রোদ খেলা করে উঠোনে, রাতের বেলায় চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করে গাছের পাতা। উঠোনে পাটি বিছিয়ে শুয়ে শুয়ে গল্প শোনা বাঙালির চিরন্তন অভ্যাস। হাওরের পানি তখন কমতে থাকে। তাই হাওরের গ্রামগুলোতে শুরু হয় বিয়ের ধুম। নৌকা সাজিয়ে বর চলে নববধূকে আনতে। জোনাকি পোকারা সরব হয়ে ওঠে বাড়ির আঙিনায়। পাড়ায় পাড়ায় শুরু হয় কিচ্ছা-কীর্তনের পালা। রাতে চাঁদের অপরূপ আলোয় চিকচিক করে নদীর পানি। আলো-আধারিতে মোহচ্ছন্ন করে মনকে। দূরে নৌকায় জেলেরা মাছ ধরে। ছোট ছেলেটা পাটাতনে শুয়ে বাবার সাথে মাছের গল্প করে, গল্প করে তার বড় বোনের পুতুল খেলার।

চুপিসারে, সংগোপনে এলেও শরৎ যেন বাংলার ভাগ্যবিধাতা। কৃষকেরা বর্ষায় ধান রোপন করে, হেমন্তে ঘরে ফসল তোলে। আর শরৎকালে সে ধানের পরিচর্চা করে আগামীর ভবিষ্যৎ নির্মাণ করে। তাই শরৎ কৃষকের পরিশ্রমের সময়, কৃষকের স্বপ্ন বোনার সময়, কৃষকের আগামী নির্মাণের সময়। শরতেই রচিত হয় কৃষকের সুখ, শরতেই নির্ধারিত হয় বাংলার মুখ। আগামী বছরটা কেমন যাবে, তা শরতেই অনুধাবন করা যায়। কৃষকের পরিশ্রম আর প্রকৃতি যখন মিলে যায়, বাংলা মায়ের তখন সুখের সীমা থাকে না। আগত নবান্নের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে বাংলা মায়ের বুক। কৃষানির মুখে হাসি, বুকে জাগে আশা। সুখী সংসারের স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে তার মন।

শরৎ আমাদের উৎসবের ঋতুও। শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু হয় শরতের আশ্বিনে। গ্রামে, গঞ্জে, শহরে, বন্দরে, নগরে, পাড়াগাঁয়ে দুর্গাপূজা আলাদা এক আমেজ নিয়ে আসে। এটি হিন্দুদের প্রধান উৎসব হলেও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে এ উৎসবে অংশগ্রহণ করে হিন্দু-মুসলিমসহ বাংলার সকল মানুষ। পুরো সপ্তাহ জুড়ে চলে আনন্দের মেলা। বাংলাদেশকে যে ৪/৫টি উৎসব আনন্দে মাতোয়ারা করে তোলে সেগুলো হলো বাংলা নববর্ষ, বিজয় দিবস, ইদ-উল-ফিতর, ইদ-উল-আযহা ও দুর্গাপূজা। শরতের আগমনে দুর্গাপূজার ডামাডোল বাজতে থাকে বলে একে শারদীয় দুর্গোৎসব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। দুর্গার প্রতিমা তৈরি, কেনাকাটা, আপ্যায়ন আর পূজার উৎসবে রঙিন হয়ে ওঠে বাংলার আকাশ-বাতাস। নির্মলতার, পবিত্রতার, শান্তিময় এমন উৎসব যেন শরৎকালেই মানায়।

তাইতো শরৎ শুভ্রতার প্রতীক। শুধু সাদা মেঘ নয়, শুধু সাদা কাশফুল নয়, শুধু পবিত্র দুর্গা নয়, বাংলা যেন সাজে সাদা ফুলের ছন্দে। শিউলি ফুলের গন্ধে ঘর থেকে মন ছুটে যায় দূর থেকে বহুদূরে। কাব্যমন আবগাহন করে নানা ফুলের সুবাসে। শিউলি, গোলাপ, বকুল, মল্লিকা, কামিনী, মাধবী প্রভৃতি ফুল ফোটে শরতে। অপরূপ শাপলা খেলা করে বিলে, ঝিলে। সাদা শাপলা। বাংলাদেশের জাতীয় ফুল। আছে লাল শাপলাও। আজকাল শাপলার বিলগুলো পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। শহর থেকে লোকজন ছুটে আসে শাপলা দেখতে; সাদা শাপলা, লাল শাপলা। ছোট ছোট নৌকায় বিলে ঘুরে বেড়ানো আর শাপলার স্পর্শ নেয়া অসাধারণ এক অভিজ্ঞতা এনে দেয় মানুষের হৃদয়ে।

পাখির কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে ওঠে শরতের আকাশ, বাতাস। ঝিঁঝিঁ পোকার আলো-সুরে মন উতালা হয়ে ওঠে। চাঁদের সোনালি আলো উঠোনে ঝিকিমিকি করে। এ যেন এক স্বর্গীয় পরিবেশ। শত অভাবের মাঝেও মন ভালো হয়ে ওঠে। সকল দুঃখ-বেদনা দূর হয়ে যায়। শরৎ শুভ্রতার ঋতু। নীল আকাশে যেমন সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায়, পালতোলা নৌকার সাদা পালের সাথে সাথে নদীর কিনারেও তেমনি সাদা কাঁশফুল হেসে ওঠে। অন্যদিকে সবুজ ধানক্ষেতে ছেয়ে থাকে মাঠ। মাঠের যেদিকে চোখ যায়, শুধু সবুজ আর সবুজ। শীষ বেরোনোর অপেক্ষায় সবুজ ধানগাছগুলো মৃদুমন্দ বাতাসে নেচে বেড়ায়। নেচে বেড়ায় কৃষক-কৃষানির মনও।

সবুজ, নীল আর সাদা রঙের এমন মিতালি আর কোন দেশে দেখা যায় না, আর কোন ঋতুতে দেখা যায় না। তাইতো শরতকে বলা হয় ঋতুর রানি। বর্ষার শেষে হেমন্তের আগমনী বার্তা নিয়ে যে শরৎ আসে, সে তার মোহিনী শক্তি দিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে রাখে। মনে হয় শরতে বাংলা সর্বাধিক সুন্দর, সর্বাধিক পবিত্র। শরতে বাংলার মানুষ আর প্রকৃতি একাকার হয়ে যায়। এসময় প্রকৃতির সাথে মানুষের লড়াই নেই; না গরমের, না বৃষ্টির, না শীতের। চুপিচুপি সে শুধু ভালোবাসার কথা বলে, শিউলি-শাপলার কথা বলে। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তখন আপন মনে গেয়ে ওঠেন-

'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি,
সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি।'

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ,
গুরুদয়াল সরকারি কলেজ, কিশোরগঞ্জ

মায়াজাল

মিয়া সালাহউদ্দিন

জানি, একদিন আমি আর আসব না
এই পৃথিবীর তলে
সবকিছু পড়ে রবে
প্রকৃতির ছায়া, নদীর কলকল ধ্বনি
ফসলের মাঠ, বাগানের ফোটা ফুল
প্রেয়সীর ভালোবাসা।

গ্রীষ্মে ঝরাপাতা ঝরে যাবে
নতুন পল্লবে ভরবে বৃক্ষ
বসন্ত আসবে বসন্ত যাবে
চারিদিকে আনন্দধ্বনি বাজবে
সেদিন আমি আর থাকব না।

নিস্তব্ধ সবকিছু
মাটির সোদাগন্ধ ছুঁয়ে ছুঁয়ে
চিরকাল থেকে যাবে এই গল্প
জীবনের খাতায় শুধু লেখা রবে।

একদিন আমি আর আসব না।

শরতের ভোরবেলা

সোহরাব পাশা

মন পোড়ে তোমার না বলা ভালোবাসা
তিরিশ বসন্তেও কাটেনি স্বপ্নের কুয়াশা,

শুধু মনে পড়ে শরতের এক ভোরে
বকুলতলায় খুব চুপিসারে
একটি অশেষ গল্প লিখেছিলে তুমি
আর ছিল না কেউ কেবল- আমি,

মাঝরাতে জানালায় থৈ থৈ জোছনায়
অকারণে চোখ ভিজে যায়-
কী কারণে- কেন জানি
সে জল আজও শুকায়নি!

কত শত রাত্রিরা হেঁটে গেছে ভোরে
কত শরতের কাশফুল, জুঁই গেছে ঝরে
সেই অসহ্য সুন্দর ভোর আজও আসেনি ফিরে;

এখানো তেমনি শিউলি, বকুল ফোটে
জানালায় নিবিড় জোছনা ওঠে
কেবল সেই ভোর নুয়ে পড়ে অন্য কোনো ঠোঁটে
মুখর হাসির রোদে তোমার সময় কাটে।

গল্প: ২য় পর্ব

লাফ দিলে পাখি হব

হরিশংকর জলদাস

আমি কোথায় যাব ঠিক না করে বললাম, 'চল।'

ওর মাকে বলে বেরিয়ে পড়লাম দুজনে। হাঁটতে হাঁটতে ঠিক করলাম- খাগড়াছড়ি যাব।

একে তাকে জিজ্ঞেস করে অক্সিজেন এসে পৌঁছালাম আমরা। এখান থেকেই খাগড়াছড়ির বাস ছাড়ে। বলাই বাহুল্য অক্সিজেন কোনো গ্যাসের নাম নয়, স্থানের নাম। চট্টগ্রাম শহরের উত্তরাংশে এর অবস্থান।

দুপুর নাগাদ দুই বাপে-বেটায় খাগড়াছড়ি শহরে পৌঁছে গিয়েছিলাম। এর আগে আমি কখনো এই শহরে আসিনি। নানা জনকে জিজ্ঞেস করে যা কিছু দেখার দেখে নিলাম। তিনটা নাগাদ একটা হোটেলে খেতে বসলাম। ভাত আর মুরগির মাংস। দু'চার গ্রাস মুখে তোলার পর দুজনেই চোখে আঁধার দেখতে শুরু করলাম। এরকম ঝাল মুরগির মাংস কখনো খাইনি আগে। দুজনের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াতে লাগল। প্রত্যুষ হা-হু করতে করতে রাস্তায় বেরিয়ে এসে নালার পাশে বসে পড়ল। দেখলাম, তার কচি মুখটি দিয়ে অবিরত লালা গড়াচ্ছে। ঠোঁট দুটো রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। দৌড়ে গিয়ে লজেন্স কিনে আনলাম কয়েকটা। প্রত্যুষের মুখে পুরে দিয়ে বললাম, 'চিবাও বাবা।'

সে যাত্রায় ওই ঝালস্মৃতি নিয়ে রাতের দিকে বাসায় ফিরে এসেছিলাম আমরা।

আরেকবার গিয়েছিলাম খাগড়াছড়ি কলেজের এক শিক্ষক রহমান সাহেবের সঙ্গে। গোটাদিন নানা দর্শনীয় স্থান দেখেছিলাম। রাতে ওই শিক্ষকের সঙ্গে কলেজের ডর্মিটরিতে ছিলাম। টিনশেডের ডর্মিটরি। পাশাপাশি বেশ কয়েকটি ঘর। আলাদা একটা ঘরে শিক্ষকদের রান্নাবান্না। কাজের ঝি দু'বেলা রেঁধে যায়। প্রত্যেক শিক্ষকের সপ্তাহের সবদিন ক্লাস থাকে না। সপ্তাহে তিন কি চারদিন। যে ক'রাত থাকতে হয়, ডর্মিটরিতে থাকেন। নামেমাত্র ভাড়া দিয়ে। রুম খালি ছিল বলে সেরাতে একটা রুমে আমাকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। ডর্মিটরির সামনে ফুলের বাগান। তবে বাগানে ফুলগাছের তুলনায় আগাছা বেশি। ঝোপঝাড় নিয়ে গোটা ডর্মিটরিটা জঙ্গুলে হয়ে পড়েছে। সেই ঝোড়ঝাড়ের মধ্যে পরিত্যক্ত একটি মাইক্রোবাস। একসময় সচল ছিল, এখন বিকল। সাদারঙের সেই গাড়িটি ঘিরে নানা রকমের লতাগুল্ম, লম্বা ঘাসের জড়াজড়ি।

খাওয়া শেষে রহমান সাহেব আমার সঙ্গে বেশ গল্পগুজব করলেন। শীতের রাত। আশপাশের রুম থেকে আরও কয়েকজন শিক্ষক এসে জুটেছিলেন ওই আড্ডাতে। রাত গভীরে যে যাঁর রুমে ফিরে গিয়েছিলেন। যাওয়ার সময় রহমান সাহেব নিচু গলায় বলেছিলেন, সাবধানে থাকবেন স্যার। খুব বেশি প্রয়োজন না হলে রাতের বেলা খাট থেকে নামবেন না।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কেন? নামব না কেন?'

'এখানে সাপের বড় উপদ্রব স্যার। ওই যে সাদা মাইক্রোবাসটা দেখছেন, ওটা সাপে ভর্তি। আমরা ওদের ঘাঁটাই না। দিনে ওখানেই থাকে, রাতে খাবারের সন্ধানে বের হয়। রাতে মাঝে মাঝে রুমগুলোতে ঢুকে পড়ে।' নিরীহ কণ্ঠে কথাগুলো বলে বিদায় নিয়েছিলেন রহমান সাহেব। আমার অবস্থা একবার ভেবে দেখুন! পৃথিবীতে যত হিংস্র প্রাণি আছে, সবচাইতে বেশি ভয় করি সাপকে। আর সেই সাপের সঙ্গে রাত কাটাতে হবে আমাকে!

পরদিন অতিভোরে কাউকে না জানিয়ে ফিরতি বাসে উঠেছিলাম আমি।

এবার সুনীতাকে নিয়ে খাগড়াছড়িতে তৃতীয়বার ভ্রমণ আমার। না না! ওরকম কোনো সর্পবহুল ডর্মিটরিতে থাকতে হয়নি আমাদের। ভালো একটা হোটেলে উঠেছিলাম। তবে ডর্মিটরির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়িটি সুনীতাকে দেখিয়েছিলাম। শিউরে উঠেছিল সুনীতা। এতবছর পরেও ডর্মিটরির চেহারা এবং গাড়িটির অবস্থান আগের মতোই ছিল।

আমরা উঠেছিলাম গাইরিং নামের একটি হোটেলে। দাউদ ভাই বুকিং দিয়ে রেখেছিলেন। একরাতে ১২০০ টাকা ভাড়া। শহরের মূলরাস্তা থেকে একটু ভেতরদিকে যেতে হলো আমাদের। ওদিকেই মিলনপুর। ওখানেই আমাদের হোটেলটি। চল্লিশ টাকা অটোভাড়া। রাস্তা আঁকাবাঁকা। কিছুটা ভাঙা, কিছুটা মেটে। দুদিকে ডোবা, পুকুর। মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু হোটেলে পৌঁছেই বিষণ্নতা কেটে গেল আমাদের। সুন্দর রিসেপশন রুমটি। আসবাবপত্র, দেয়ালচিত্র আমাদের টানল খুব।

হোটেল-ম্যানেজার প্রান্তবিকাশ ত্রিপুরা দোতলায় বেশ সুন্দর একটা রুম দিল আমাদের। হাইকমোড, সোফা, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদিতে সুসজ্জিত।

ব্যাগট্যাগ রেখে দুপুরখাবার খেতে বের হলাম। খাব কোথায়? আসবার সময় অটোওয়ালা বলেছিল, 'ভালো খেতে চাইলে সিস্টেমে খাবেন।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'সিস্টেম! সিস্টেম আবার কী?' দ্রুত ভেবে নিলাম- সিস্টেম মানে তো পদ্ধতি! পদ্ধতির সঙ্গে খাবারের সম্পর্ক কী?

হেসে অটোওয়ালা বলেছিল, 'সিস্টেম রেস্টুরেন্টের নাম। দুবেলার খাবারই বেচে ওরা। গাইরিং থেকে বেশি দূরে নয়। ত্রিশ টাকা অটোভাড়া।'

'তারপর হোটেল রিসেপশনে একবার জিজ্ঞেস করলে ভালো হয় না?' সুনীতা বলল।

শুনে প্রান্তবিকাশ বলল, 'সিস্টেমে খাবেন কেন স্যার? আমাদের এখানেই তো খাবার আছে। যা চাইবেন, তা পাবেন।'

'কিন্তু আমাদের যে একবার সিস্টেমে খেতে ইচ্ছে করছে ম্যানেজার বাবু! রাতে না হয় আপনাদের এখানে খাই?'

'ঠিক আছে স্যার। যেকোন অটোওয়ালাকে বলুন, নিয়ে যাবে।'

সিস্টেমের দরজায় অটো থেকে নেমে ভীষণ হতাশ হলাম। এই যদি ঘরের অবস্থা হয়, খাবারের মেনু কী রকম হবে- ভেবে অস্থির হয়ে উঠলাম।

নড়বড়ে ইটের গাঁথুনির ওপর বহুদিনের পুরনো টিনের ছাউনি। রাস্তা থেকে একটা ঘিঞ্জি গলি এগিয়ে গেছে। মাথা নিচু করে সেই গলি বেয়ে একটা বড় রুমের মধ্যে ঢুকলাম। বেশ কখানা টেবিল পাতানো। চারপাশে প্লাস্টিকের চেয়ার। কয়েকটিতে বসে আমাদের মতো পর্যটকরা গাপুসগুপুস করে খাচ্ছেন। চল্লিশ ওয়াটের গোটা তিনেক বাল্ব তাদের সর্বশক্তি দিয়ে রুমটাকে আলোকিত করে রাখবার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

খালি একটা টেবিল দেখে আমি আর সুনীতা বসে পড়লাম। তাকিয়ে দেখলাম- অদূরের দীর্ঘ প্রশস্ত একটা বেঞ্চিতে সারি সারি ডেক্সি-হাণ্ডি। ওখানে নানা পদের রান্না। হোটেলবয়দের দিকে তাকালাম। আরে! ওরা একজনও তো বাঙালি নয়! সবাই যে পাহাড়ি! চাকমা ওরা। নিজেদের ভাষায় কথা বলে যাচ্ছে অবিরাম। আর এ টেবিলে- ও টেবিলে খাবার পরিবেশন করে যাচ্ছে। সুনীতা বলল, 'ওরা তো সবাই পাহাড়ি। মালিকও নিশ্চয়ই পাহাড়ি। এখানে বাঙালি খাবার পাবে কোথায়?'

চাপাস্বরে বললাম, 'ফেরার উপায় নেই। যা থাকে কপালে!' বলে হাত-ইশারায় একটা বয়কে ডাকলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী পাওয়া যায়?'

ও বলল, 'লাউ-চিংড়ি, লালশাক, আলুভর্তা, বেগুনভর্তা, ঢেড়সভাজি, রুই মাছ, ভেটকি মাছ, মুরগির...।'

'থাম থাম! আর বলতে হবে না। আমাদের জন্য দু'প্লেট ভাত, লাউ-চিংড়ি, মুরগির মাংস।' বললাম আমি।

মুখে গ্রাস তুলে তাজ্জব বনে গেলাম। এত স্বাদের লাউ-চিংড়ি আগে তো কোনদিন খাইনি! আর জীবনে বহুবার বহু হোটেলে মুরগি রান্না খেয়েছি, এখানকার মতো স্বাদযুক্ত মুরগির মাংস কোথাও খাইনি তো!

পেটভর্তি করে খেলাম দুজনে। আজও বহু জায়গায় মুরগি রান্না খেয়ে যাচ্ছি, কিন্তু সিস্টেমের রান্নাকে ডিফিট দিতে পারেনি।

রাতে গাইরিং-এর রেস্টুরেন্টে খেয়েছিলাম আমরা। সিস্টেমের তুলনায় ওই রান্না বড় বিস্বাদ লেগেছিল।

সেই সন্ধ্যায় দাউদভাই আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। সঙ্গে তার এক বন্ধুও ছিলেন। তিনি আসতে একটু দেরি করেছিলেন। আমরা আগেই রিসেপশন রুমে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

আমাদের সামনের সোফায় এক নারী আর এক পুরুষ বসেছিলেন। দুজনেরই বয়স চল্লিশের আশেপাশে। নারীটি বেশ রূপসি। ফরসা। দোহারা গড়ন। সেলোয়ার-কামিজ পরা। পুরুষটিও সুন্দর। পাতলা শরীর। বেশ ফিটফাট ড্রেস। নিজেদের মধ্যে আলাপে ব্যস্ত তাঁরা।

দউদ ভাই এলে ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, 'ইনি অনন্তবিকাশ ত্রিপুরা। গাইরিং-এর মালিক।' অনন্তবাবু স্বভাবসুলভ বিনয়ে বিগলিত হলেন। বললেন, 'আমার পাশের জন আমার স্ত্রী।'

আমরা দুজনে নমস্কার জানালে কোনো প্রত্যুত্তর করলেন না ভদ্রমহিলাটি। এমনভাবে করে বসে থাকলেন, যেন ওঁর কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি আমরা।

আমাদের মনক্ষুণ্ণের ব্যাপারটি বুঝে গেলেন অনন্তবাবু। দ্রুত কফির অর্ডার দিলেন।

এর মধ্যে দাউদ ভাই আমার পরিচয় বেশ ফলাও করে দিলেন। অনন্তবাবু বিনয় আরও বেড়ে গেল। এরপর ঘণ্টাখানেক নানা বিষয়ে আলাপ হলো। সাজেক-এর কারণে খাগড়াছড়ির অর্থনৈতিক অবস্থা যে দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে, বারবার করে বললেন অনন্তবাবু। পাশ থেকে স্ত্রী তাড়া দিলেন, 'আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে। খেয়াল আছে সেদিকে তোমার?' অনন্তবাবু বললেন, 'আজ রাতে বন্ধুদের গেট-টুগেদার আছে। আমাদের যে উঠতে হয় দাদা!'

আমি বললাম, 'তা বেশ। আসুন আপনারা।'

যাবার সময় অনন্তবাবু ওদের নিজস্ব ভাষায় কিছু একটা বলে গেলেন ম্যানেজারকে।

সেই কথার অর্থ তখন না বুঝলেও সকালে বুঝেছিলাম। ঘরভাড়া বারোশ টাকা হলেও ম্যানেজার একহাজার টাকা নিয়েছিল। বলেছিল, 'অনন্তস্যার বলে দিয়েছেন একহাজার নিতে।'

ওঁরা চলে গেলে দাউদ ভাই আরও কিছুক্ষণ ছিলেন। বলেছিলেন, 'সকালে খায়ের নামের একজন সিএনজি-চালক আসবে। সে আপনাদের সাজেক নিয়ে যাবে। পরেরদিন সকালে সাজেক থেকে রওনা দেবে। ওর কেনো খাওয়াখরচ, রাতের থাকাখরচ দিতে হবে না। ওকে চার হাজার পাঁচশত টাকা দিলেই হবে।' আমাদের সামনেই খায়েরকে ফোন করলেন তিনি। ভোরে চলে আসতে বললেন। আমাদের বললেন, যত তাড়াতাড়ি যাবেন, তত ভালো। আমাকে খায়েরের মোবাইল নাম্বরটা দিলেন।

অপরাহ্নের একটা কথা লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম। লিখছি। সিস্টেম থেকে খেয়ে আসার পর আমার কাছে ফোন এসেছিল। ওপাশ থেকে একজন বললেন, 'আমি তরিকুল ইসলাম। কবিতা লিখি। খাগড়াছড়ি শহরে থাকি। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

ঘড়ি দেখলাম। সন্ধ্যে হতে আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক বাকি। আমি রাজি হয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় দেখা হবে।'

বললেন, 'একটা অটো নিয়ে শহরের শাপলা চত্বরে চলে আসুন। ওখানে আমরা অপেক্ষা করব।'

কবিরা আমার খুব প্রিয়জন। তাদের জন্য আমি গলাপানিতে নামতে পারি। সস্ত্রীক উপস্থিত হলাম শাপলা চত্বরে। দেখলাম, হোন্ডা নিয়ে জনাতিনেক অপেক্ষা করছেন। একজন এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি তরিকুল। আমিই ফোন দিয়েছিলাম আপনাকে। শ্মশ্রুমণ্ডিত একজনকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি রফিকুল ইসলাম। একটা স্কুলের সহকারি প্রধান শিক্ষক। কবিতাপ্রেমী। তবে আমাদের সঙ্গে যথার্থ একজন কবিও আছেন। ক্যাজসাই মারমা।'

ক্যাজসাই মারমা নমস্কার জানিয়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

তরিকুল বললেন, 'ক্যাজসাই বাংলায় যেমন কবিতা লিখেন, মারমা ভাষাতেও লিখেন।

উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। 'আমি কোনোদিন মারমা ভাষায় কবিতা শুনিনি। শুনতে চাই।'

ক্যাজসাই বললেন, 'চলুন। আমরা একটা জায়গায় বসি।'

'কোথায় যাওয়া যায় তাহলে?' বললেন তরিকুল।

ক্যাজসাই বললেন, 'জেলাপরিষদ পার্কে চলেন।'

তরিকুল অটোওয়ালাকে বললেন, 'পার্কে চল। জিরোমাইলে।'

ওঁরা তিনজন, আমরা দুজন- মোট পাঁচজনের জন্য পার্কে ঢোকার টিকেট কিনলেন তরিকুল।

এখানে তরিকুল ইসলাম সম্পর্কে দু'একটি কথা লিখলে তাঁকে বুঝতে সুবিধা হবে। ব্যক্তিজীবনে তিনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। মহালছড়ি উপজেলার শুক্রমণি চাকমা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ান তিনি। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়- তিনি একজন কবি। পার্বত্য অঞ্চলে যাঁরা বাংলা ভাষায় কবিতা চর্চা করছেন, তাঁদের মধ্যে গণনীয় তরিকুল। তাঁর কবিতায় পাহাড় অরণ্য-ঝরনা, পাখপাখালি মানবজীবনের সুখ-দুঃখের অনুষঙ্গ হয়ে চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, হচ্ছে।

পার্কের ভেতরে ঢুকে হতবাক আমরা। এত সুন্দর একটা পার্ক গড়ে উঠেছে খাগড়াছড়িতে! পাহাড়ের গা বেয়ে নিচের দিকে নামার সিঁড়ি। নিচে জলাশয়। জলাশয় ঘিরে বসার নানারকম চেয়ার। এই জলাশয়টিকে ঘিরে চারদিকে পাহাড়। সন্ধ্যে হতেই লাল-নীল-সবুজ-হলুদ নানারঙের বাতি জ্বলে উঠল চতুপার্শ্বে। কোনো বাতি টুপটাপ জ্বলছে আর নিবছে, আবার কোনোটা স্থির হয়ে আলো ছাড়াচ্ছে। আমার আচমকা সিঙ্গাপুরের একটা পার্কের কথা মনে পড়ে গেল। মেরিনা-বে সেন্ডস্ মার্লিন পার্ক। এটা একটি লাইটশো পার্ক। সন্ধ্যে হওয়ার আগে শত শত দেশি-বিদেশি পর্যটক এই পার্কে সমবেত হন। সাতটায় শুরু হয় লাইটশো। হাজার হাজার নানারঙের বাতি কুড়ির অধিক টাওয়ারে বাজনার তালে তালে জ্বলছে, রং পাল্টাচ্ছে, নাচছে, চোখ রাঙাচ্ছে। কী যে অদ্ভুত সেই দৃশ্য লিখে বোঝানো যাবে না।

খাগড়াছড়ির এই পার্কটিতে সিঙ্গাপুরের পার্কটির আবেদন-আমেজ নেই ঠিক, কিন্তু আমার মনে হলো- যিনি এই পার্কটির পরিকল্পক, তিনি নিশ্চয়ই সিঙ্গাপুরের ওই মার্লিন পার্কটি ঘুরে এসেছেন।

পার্কের মধ্যে পাহাড়ি নারীরা পিঠার নানা পসরা সাজিয়ে বসে আছেন। বেরোবার আগে অনেক পিঠে গলাধঃকরণ করেছিলাম, সবাই মিলে।

এর আগে অবশ্য ক্যাজসাই মারমা টিলার মাথায় এক পাহাড়ি নারীর দোকানে নিয়ে গিয়ে চা খাইয়েছিলেন। সঙ্গে পাঠ করেছিলেন মারমা ভাষার কবিতা। সেই কবিতায় প্রেমিকার বিরহে একজন প্রেমিকের রক্তক্ষরণের কথা বারবার ধ্বনিত হচ্ছিল। কবিতাটি বঙ্গানুবাদ করে ক্যাজসাই শুনিয়েছিলেন বলে মর্মার্থটা বুঝতে পেরেছিলাম।

পরদিন আমাদের যাত্রা শুরু হলো। অরণ্যের মধ্যদিয়ে। পাহাড়-অভিমুখে। সাজেকের সেই শীর্ষচূড়া আমাদের গন্তব্য। আমরা যারা দার্জিলিং যাইনি, তাদের কাছে সাজেক দার্জিলিং হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। যাঁরা গেছেন দার্জিলিং এবং সাজেক, তাঁরাই বলেছেন, প্রত্যেক পাহাড়প্রেমিকের একবার অন্তত সাজেক ছুঁয়ে দেখা উচিত। লুব্ধ আমরা, সেই কথায় বিভোর হয়েছি। নাহ! সাজেক যেতেই হবে! ওই যেতেই হবে- অভিপ্সায় আমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত।

এই যে ভ্রমণের বৃত্তান্ত, তা তো জীবনেরই দিনক্ষণের বিবরণ! মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ঘিরে কতই-না ঘটনা-উপঘটনা, কতই না সুখ- দুঃখের স্মৃতি-ক্লান্তি! ভ্রমণ-সময়ের মধ্যেও সেই শ্রান্তি-ক্লান্তি, স্বস্তি-বিপন্নতা বিদ্যমান। মূলত ভ্রমণের বৃত্তান্ত মানে জীবনেরই হিসেব-নিকেশের শিথিল বর্ণনা। সেই বর্ণনায় একজন মানুষের দেখার অভিজ্ঞতা, দিন ও রাত্রিযাপনের বিবশ-বিলাসিতা থাকে। আমার এই লেখাতেও সেরকম বিবরণ দুর্নিরীক্ষ্য নয়। এখানে পাওয়ার সুখানুভূতি যেমন বর্ণিত হয়েছে, তেমনি তিক্ততার বিস্বাদও পাওয়া গেলে আশ্চর্যের কিছুই থাকবে না।

অতি প্রত্যুষে আমাদের রওনা দেওয়ার কথা ছিল। খায়ের, সিএনজিচালিত বাহনের ড্রাইভার হোটেলে পৌঁছাতে একটু দেরি করল। তাই সাড়ে ছটার আগে আমরা যাত্রা শুরু করতে পারলাম না।

আমাদের ড্রাইভার-অভিজ্ঞতা অম্লমধুর। মধুরতার চেয়ে অম্লতার ভাগ অধিক। মনে পড়ে ভুটানের ড্রাইভারটির কথা। ওয়াং চুক কি ওই ধরণের নাম। ছোটখাটো চেহারাখানা- থুতনিতে একগোছা দাড়ি। গাড়ি নিয়ে রাজধানী থিম্পুর এয়ারপোর্টে এসেছিল সে। পরনে-গায়ে ওদেশেরই জাতীয় ড্রেস। প্রথম সাক্ষাতেই সে নিজেকে ওই ট্রাভেল এজেন্সির মালিক হিসেবে পরিচয় দিল। যে এজেন্সির মাধ্যমে আমরা ভুটান গেছি। বলল, হঠাৎ নির্ধারিত ড্রাইভারটি ছুটি নেওয়ায় মালিক হওয়া সত্ত্বেও তাকে আসতে হলো। বিদেশি পর্যটককে তো আর বিপদে ফেলা যায় না! বিশ্বাস করেছিলাম তাঁর কথা। তিনদিন ছিল সে আমাদের সঙ্গে। ওই তিনদিন আমাদের সঙ্গে খাতক-জমিদারের মতো ব্যবহার করেছে। সুযোগ বুঝে ধমক দিয়েছে, নিকৃষ্ট হোটেলে খাইয়েছে, খাবার নিয়ে ট্যাঁ-ফোঁ করতে চাইলে কঞ্চি-হাতের হেডমাস্টারের মতো ব্যবহার করেছে। ভ্রমণের সময়ে খাওয়ানোর দায়িত্ব আমরা না বুঝে এজেন্সিকে দিয়েছিলাম। যা হোক, ধমক-ধামক খেয়ে দিনগুলো পার করেছি আমরা, মানে আমি, সুনীতা এবং আমাদের পুত্র প্রত্যুষ।

যে-সকালে সে আমাদের ফেরার প্লেনে তুলে দিতে এয়ারপোর্টে এল, প্রত্যুষের কাছে ধরা পড়ে গেল, সে ওই এজেন্সির অন্য দশজন ড্রাইভারের একজন। ধরা পড়ায় লজ্জার ছিটেফোঁটাও দেখিনি আমি ওয়াং চুকের মুখে। ড্রাইভার নিয়ে এরকম আরও বহু অভিজ্ঞতা আমার ঝুলিতে আছে। সময়ে বের করা যাবে। এখানে খায়েরের কথা বলা যাক।

নোয়াখালির দিকে খায়েরের বাড়ি। কথায় ও-রকমই টান। দীর্ঘদেহী। বড় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। গায়ের রং কালোর দিকে। বড় শরীরটির মধ্যে নরম একটি মন। গোটা জার্নিতে আমরা তার নরম মনের পরিচয় পেয়েছি। ভদ্রজনোচিত ব্যবহার সে জানে। দু'দিন একরাত ছিল সে আমাদের সঙ্গে। ড্রাইভারদের প্রতি আমার মনোভাবই পালটে দিয়েছিল সে।

কুয়াশার ভেতর দিয়ে অরণ্যপথ চিরে দুর্দান্ত বেগে গাড়ি ছুটিয়েছিল খায়ের। গাড়ির গতি কমাতে বললে বলেছে, আটটার মধ্যে বাঘাইছড়িতে পৌঁছাতে না পারলে সমস্যায় পড়ব আমরা। কী সমস্যা জিজ্ঞেস করার উত্তর দেয়নি খায়ের। বাঘাইছড়িতে পৌঁছে সমস্যাটা টের পেয়েছিলাম। বাঘাইছড়ি বাঘাইহাট ইউনিয়নের একটা এলাকা। এখানে মিলিটারি চেকপোস্ট আছে। এই চেকপোস্টের পরের রাস্তা বিপজ্জনক। খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙামাটি- এই তিন পাহাড়ি জেলায় চাকমা, মারমা, বম, খিয়াং, কুকি, মুরং- এসব আদিবাসীর বসবাস। বহুবছর ধরে প্রকৃতির কোলে আপনস্বভাবে বসবাস করে যাচ্ছিল এরা। বিঘ্ন শুরু হলো তখনই, যখন সমতল এলাকার বাঙালিরা পাহাড়ি অঞ্চলে গিয়ে বাস করতে শুরু করল। বাঙালিদের এ বসবাসকে সহজভাবে মেনে নিল না ওরা। ভাবতে শুরু করল- ওদের অরণ্য অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্যই বাঙালিরা পাহাড়ে চড়ে বসেছে। হাতে অস্ত্র তুলে নিল তারা। শুরু হলো অশান্তি। এই অশান্তি চলমান থাকল দীর্ঘসময় ধরে। অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ল পার্বত্য অঞ্চলের নানা স্থানে। খাগড়াছড়ির এই এলাকাটাও নিরাপদ থাকল না। পর্যটকরা বিপদের কথা না ভেবে নিরন্তর সাজেক যাওয়া অব্যাহত রাখল। সরকার তাদের নিরুৎসাহিত করল না। করল যা, বাঘাইছড়ি থেকে পর্যটকদের গাড়ির সারিকে সামরিক যান দিয়ে স্কর্ট করে সাজেক পর্যন্ত পৌঁছাতে শুরু করল। একবার সকাল আটটায়, আবার সকাল দশটায়। বাঘাইছড়িতেই যানবাহনকে টোকেন দেওয়া হয়। ওই টোকেন দেখালেই নিরাপত্তা কর্মীরা গাড়িকে রওনা হবার অনুমতি দেয়।

আমাদের যেতে দেরি হওয়ায় খায়ের আটটার টোকেনটা পেল না। দশটার জন্য অপেক্ষা করতে বাধ্য হলাম। আটটার মধ্যে যে গাড়িগুলো বাঘাইছড়িতে পৌঁছাতে পেরেছে, তারা আমাদের ছেড়ে পাহাড়ের আঁকাবাঁকা উত্তুঙ্গ পথ বেয়ে এগিয়ে গেল। আমি আর সুনীতা বোবা চেহারা নিয়ে ট্যাক্সির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলাম। মিনিট পনের পর কোত্থেকে এক মিলিটারি কর্মকর্তা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। খায়েরকে লক্ষ্য করে উচ্চঃস্বরে বললেন, না গিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন! খায়ের টোকেন না পাওয়ার কথাটি বললে ওই কর্মকর্তা আমাদের দিকে একবার তাকালেন। তারপর টোকেন-অফিসে ঢুকে গেলেন। সামান্য সময়ের ব্যবধানে অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। খায়েরের দিকে টোকেন বাড়িয়ে ধরে সামনের পথের দিকে আঙুল উঁচিয়ে ধরলেন। আমরা ওঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পেলাম না। তার আগেই আমাদের গাড়ি চলতে শুরু করল।

গাড়ি গতিময়। আমাদের মনে অদ্ভুত এক শিহরণ। উঁচুতে উঠার রোমাঞ্চ। মানুষ এমনিতেই উঁচুতে উঠতে আগ্রহী। এটা তার রক্ত-স্বভাব। ক্লাসরুমে পড়ান যখন মাস্টার মশাইরা, মেঝের সমতল ছেড়ে কাঠের উচুঁ বেদিতে উঠে দাঁড়ান। শরীর যত উঁচুতে ওঠে, মনও নাকি তত উন্নত ও প্রসারিত হয়। জানি না একথা কতটুকু সত্য। তবে মুহূর্তে বাঁক নেওয়া পথ ধরে আমরা যতই পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরের দিকে উঠছিলাম, এক অপার্থিব আনন্দে মন ভরে উঠছিল। ওই আনন্দের নামই বোধহয় প্রসারণ।

আমাদের গাড়ি চলছে। একা। এই মুহূর্তে তার কোনো প্রতিযোগী নেই। ছিল যারা তারা খায়েরের গাড়িকে ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আগে। গাড়ির গতি কমায়নি খায়ের। দুপুরের আগেই যে সাজেক-শীর্ষে পৌঁছাতে হবে। যত ওপরে উঠছে ট্যাক্সি, বিপজ্জনক আঁকবাঁক ভাঙছে, ততই ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে সুনীতা। এরকম অভিজ্ঞতা তার আগে একবার হয়েছিল বটে, কাঠমাণ্ডু থেকে পোখরা যাবার পথে, তখন গাড়িটি ছিল মাহেন্দ্র; আর এখনকার গাড়িটিতো ঠুনকো, মুড়ির টিনের মতো। একটু এদিক-ওদিক হলেই চিড়ে-চ্যাপ্টা।

যতই আমি রাস্তার পাশের অতলান্ত খাদ দেখাতে যাই সুনীতাকে, ততই দুচোখের পাতা খুব জোরে বন্ধ করে রাখে। বিড়বিড় করে তার ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করতে থাকে।

আমি অরণ্য দেখি। খাদ দেখি। লাফ দিলে মৃত্যুর স্বাদ কেমন হবে ক্ষণকাল ভাবি। লাফ দিলে তো পাখি হব। পাখির মতো দুবাহু ছড়িয়ে আকাশে উড়তে পারার কী যে আনন্দ, তা শুধু পাখিরাই পেয়ে গেল!

গাছের পাতা থেকে শিশিরকণা শুকাতে শুরু করেছে অনেক আগেই। কাছের কুয়াশা কেটে গেলেও দূরের ধূয়াশা রয়ে গেছে এখনো।

এপাশ-ওপাশ দেখতে দেখতে একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল আমার। রাস্তার দু'ধারে, দূরে কাছে, বালক-বালিকারা দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে। তাদের হস্তভঙ্গিতে স্বাগতমের উষ্ণতা। বড় ভালো লেগে গেল আমার। ধুর! শুধু শুধু ভয় দেখানো হচ্ছে আমাদের! আক্রমণের! আক্রমনই যদি করবে ওরা, তাহলে তাদের সন্তানরা আমাদের উষ্ণ সম্ভাষণ জানাবে কেন? আরও ঠাহর করে দেখলাম, রাস্তার নিকট-ঘেঁষে যে বাড়িগুলো, সেই বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে মারমা বা চাকমা বা মুরং অথবা বমজাতির নারীরা ডান-বাম হাতে কী যেন ইশারা করে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই তারা পর্যটকদের ভালোবাসা জানাচ্ছে। মন থেকে মুহূর্তেই ক্লান্তি অপসারিত হয়ে গেল। তেমন শিক্ষিত না হোক ওরা, অরণ্য তাদের অতিথি-বাৎসল্যের শিক্ষাটা পুরোমাত্রায় দিয়েছে। আহা! অরণ্যবাসী, তোমাদের প্রতিও অগাধ ভালোবাসা আমার!

বাঘাইছড়ির মিলিটারি চেকপোস্ট থেকে ঘণ্টা দেড়েক চালানোর পর খায়ের গাড়ি চালানো থামিয়ে দিয়েছিল। পাহাড়ের জিলিপির প্যাঁচের মতো রাস্তা অতিক্রম করতে করতে ট্যাক্সির দম হারানোর অবস্থা হয়েছিল। প্রচণ্ড গরম হয়ে গিয়েছিল ইঞ্জিন। ঠাণ্ডা করা দরকার। তাই থামিয়েছিল খায়ের। থামিয়েছিল পাহাড়ের গায়ে খাঁজকাটা ছোট একটা সমতলে। অনেক গাড়ি থেমে ছিল ওখানে। ঠিক ওপাশেই চা-বিস্কুট-কলা-ডাবের দোকান। আদিবাসী-দম্পতি চালায়। খিদেও পেয়েছিল বেশ। দাম সমতলের চেয়ে বেশি হলেও, হওয়া স্বাভাবিক। সমতলের দ্রব্যাদি এই উত্তুঙ্গ পাহাড়ে আনতে তো খরচ লাগে, চা-বিস্কুট-কলা খেলাম। খায়েরও বাদ গেল না।

আধঘণ্টা পরে যাত্রা শুরু হলো পুনরায়। সামনের রাস্তা প্রায় সত্তর ডিগ্রি খাড়া। গাড়ি স্টার্ট নেওয়ার আগে খায়ের মৃদুগলায় বলল 'ভয় পাবেন না। সামনের রাস্তা ভয় পাওয়ার মতো। আমার সঙ্গে কথা বলবেন না। নিজেরাও বলবেন না।' উদ্দিষ্ট যে আমার স্ত্রী, বুঝতে অসুবিধা হলো না। আসতে আসতে খায়ের বুঝে গেছিল, সুনীতা পাহাড়ি রাস্তায় ভয় পায়। যা বোঝার সুনীতা বুঝে নিয়েছিল। তার ঠোঁট নড়তে শুরু করেছিল। বিপদতাড়ন মধুসূদনের কাছে ও বোধহয় সাহস ভিক্ষে করছিল।

দাঁড়ানো অবস্থা থেকে ভয়ানক গতিতে ট্যাক্সি চলতে শুরু করল। সামনের রাস্তা দেখে হাঁ-করে তাকিয়ে থেকেছিলাম শুধু। মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তটা ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করে যাচ্ছিলাম।

(চলবে...)

লেখক: কথাসাহিত্যিক

মাটি ও মানুষের শিল্পী এস এম সুলতান

জায়েদুল আলম

চিত্রা নদীর পাড়ে ঝাঁকড়া চুলের এক নিবিষ্ট মানব এঁকেই চলেছেন বাংলার গ্রামীণ জীবন, কৃষক, আবহমান বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্য, দ্রোহ-প্রতিবাদ এবং প্রতিকূলতার মধ্যেও টিকে থাকার অনন্ত সংগ্রাম। চোখের পুরু লেন্সের চশমা হেলে পড়ছে, তবুও থামছে না হাত। সেই চোখে কী অদ্ভুত এক জ্যোতির ছাপ। সচরাচর আমরা দেখি কৃষকের রুগ্ন চেহারা, মেদহীন এক শীর্ণকায় প্রতিকৃতি, কৃশ। আর সেই পুরু লেন্সের মধ্য দিয়ে সে চোখ দেখে বলিষ্ঠ, পেশিবহুল কৃষকের ছবি। আঁকতে থাকেন বিদ্রোহ, চিরন্তন অন্নদাতার প্রকৃষ্ট ছবি। বলছিলাম খ্যাতিমান একজন শিল্পীর কথা।

তিনি আর কেউ নন- আমাদের প্রিয় শিল্পী নড়াইলের এস এম সুলতান। তাঁর পুরো নাম শেখ মোহাম্মদ সুলতান। তবে এস এম সুলতান নামেই তিনি অধিক পরিচিত। ১৯২৩ সালের ১০ আগস্ট নড়াইলের মাছিমদিয়ার এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে বাংলার এই কৃতি সন্তানের জন্ম। পারিবারিক ডাক নাম লাল মিয়া। দারিদ্রের শত বাধা থাকা সত্ত্বেও ১৯২৮ সালে তাঁর পিতা তাঁকে নড়াইলের ভিক্টোরিয়া কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। পাঁচ বছর পর থেমে যায় পড়াশোনা। এরপর বাবার সঙ্গে রাজমিস্ত্রির কাজ ধরেন। তাঁর বাবা শেখ মোহাম্মদ মেসের আলী মূলত কৃষক হলেও রাজমিস্ত্রীর কাজও করতে হতো তাঁকে। সুলতানকে স্কুলে পড়ানোর মতো সামর্থ্য ছিল না পরিবারের। তাই পঞ্চম শ্রেণিতে পড়া অবস্থাতেই তাঁকে স্কুলের পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়েছিল। এখানেই এস এম সুলতানের শুরু। চলতে থাকে বিভিন্ন দালানে দালানে ছবি আঁকা। দশ বছর বয়সের স্কুলজীবনে, স্কুল পরিদর্শনে আসা ডা. শাম্যপ্রসাদ মুখার্জ্জীর ছবি এঁকে সবার তাক লাগিয়ে দেন। দরিদ্র ঘরের সুলতানের ইচ্ছে ছিল কলকাতা গিয়ে ছবি আঁকা শিখবেন। এসময় তাঁর প্রতিভায় চমৎকৃত হয়ে এলাকার জমিদার ধীরেন্দ্রনাথ রায় তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেন। ১৯৩৮ সালে এস এম সুলতান কলকাতায় চলে আসেন। এসময় কলকাতায় এসে তিনি ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের বাড়িতেই ওঠেন। ইচ্ছে ছিল অর্থ উপার্জনের পাশাপাশি শিল্প শিক্ষা। এসময় তিনি কলকাতা আর্ট স্কুলের গভর্নিং বডির সদস্য প্রখ্যাত শিল্পী ও সমালোচক শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে আসেন। সুলতানের শিক্ষার জন্য তিনি তাঁর গ্রন্থাগারের দরজা উন্মুক্ত করে দেন এবং সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকেন। ১৯৪১ সালে শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর সহযোগিতায় তিনি কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। তিন বছর আর্ট স্কুলে পড়ার পর তিনি ফ্রিল্যান্স শিল্পীর জীবন শুরু করেন। আর্ট স্কুলের বাঁধাধরা জীবন তাঁর ভালো লাগেনি। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা ও ভবঘুরে প্রকৃতির। তাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার রীতিনীতি তিনি মেনে নিতে পারেননি। তিনি ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমী একজন আবেগী মানুষ তাই তিনি অস্বীকার করেছিলেন যান্ত্রিকতাপিষ্ট নগর ও নাগরিক জীবনকে। ১৯৪৩ সালে তিনি খাকসার আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি বেরিয়ে পড়েন উপমহাদেশের পথে পথে। ছোট বড় শহরগুলিতে ইংরেজ ও আমেরিকান সৈন্যদের ছবি আঁকতেন। ছবি প্রদর্শনী ও ছবি বিক্রি করে চলত তাঁর জীবন। শিল্পী হিসেবে তিনি তখন কিছুটা পরিচিতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু জাগতিক বিষয়ের প্রতি ছিল তাঁর প্রচণ্ড অনাগ্রহ। শিকড় ছড়াবার আগেই তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন। আর তাই তখনকার আঁকা তাঁর ছবির নমুনা, এমনকি ফটোগ্রাফও এখন আর নেই। তবে সেসময় তিনি নৈসর্গিক দৃশ্য ও প্রতিকৃতির ছবি আঁকতেন। কাশ্মীরে কিছুদিন থেকে তিনি প্রচুর ছবি এঁকেছিলেন। সিমলায় ১৯৪৬ সালে তাঁর আঁকা ছবির প্রথম প্রদর্শনী হয়।

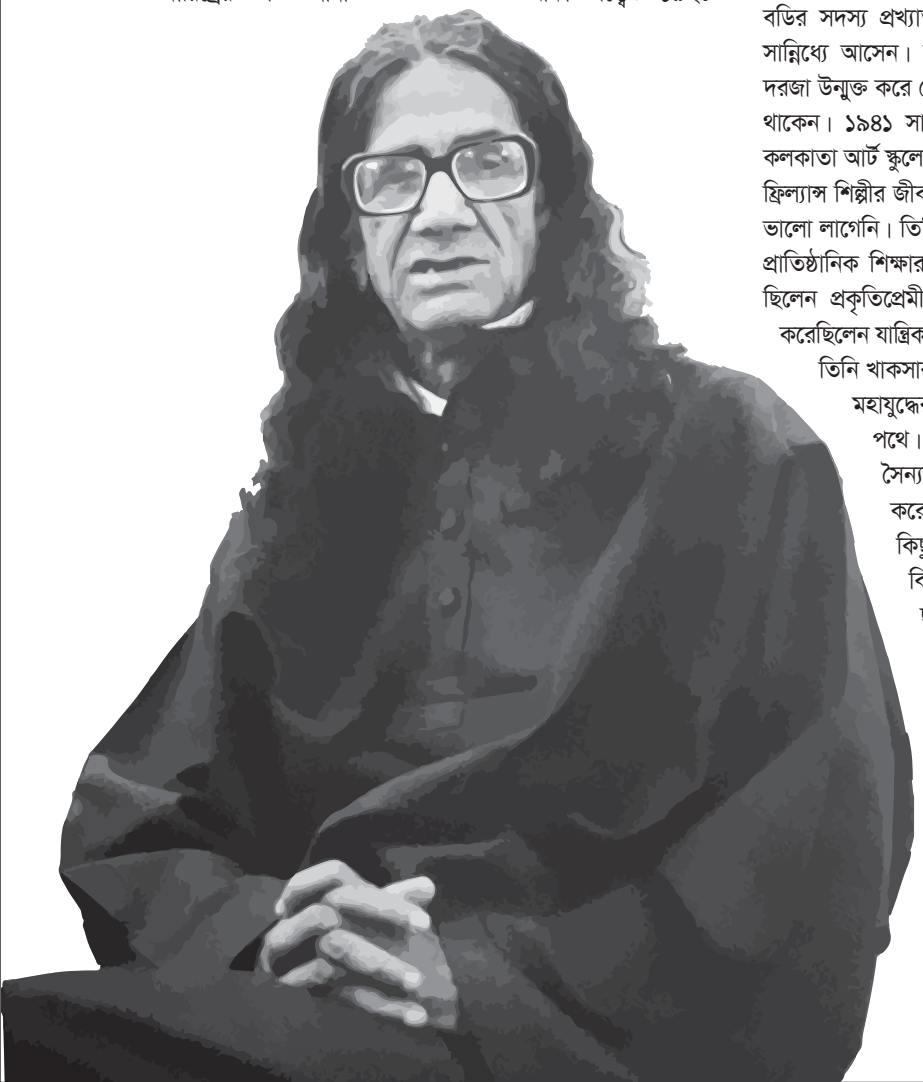

দেশ বিভাগের পর কিছুদিনের জন্য সুলতান দেশে ফেরেন। কিন্তু এরপরই ১৯৫১ সালে

গ্রামীণ জীবন থেকেই তিনি আবিষ্কার করেছেন বাঙালি জীবনের উৎস কেন্দ্রটি, বাঙালির দ্রোহ ও প্রতিবাদ, বিপ্লব ও সংগ্রাম, নানান প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকার ইতিহাস, অনুপ্রেরণা

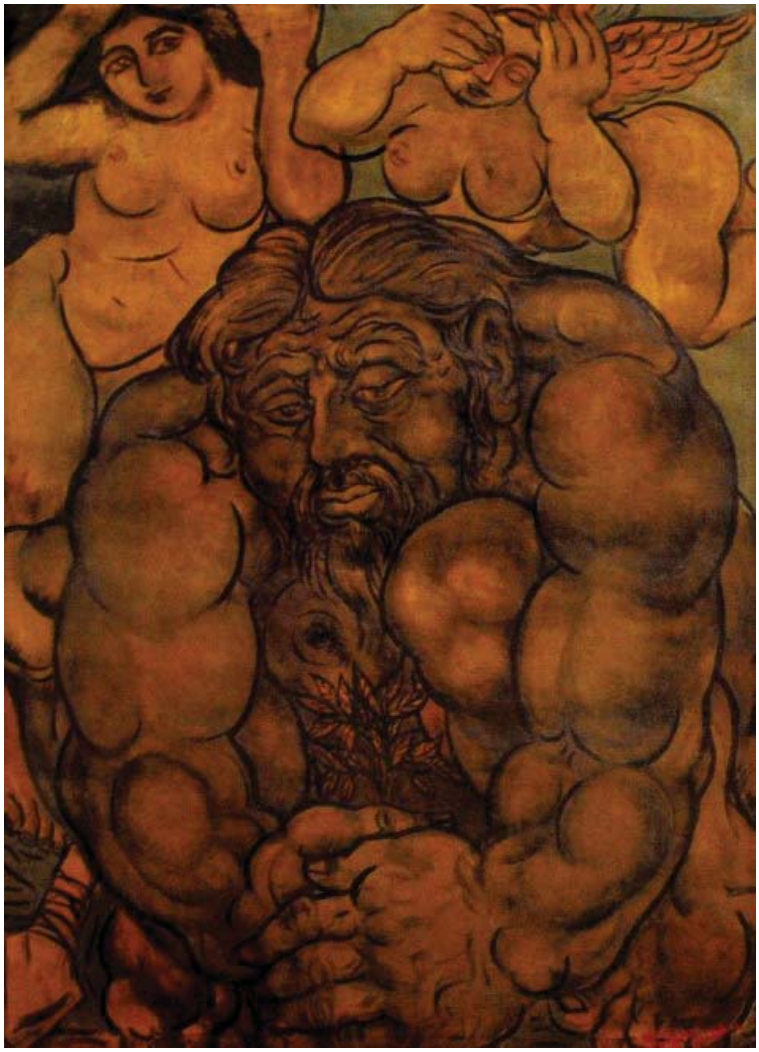

তিনি করাচি চলে যান। সেখানে পারসি স্কুলে দু'বছর শিক্ষকতা করেন। সেসময় চুঘতাই ও শাকের আলীর মত শিল্পীদের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। এর আগে ১৯৫০ সালে তিনি আমেরিকায় চিত্রশিল্পীদের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেন এবং নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, শিকাগো, বোস্টন ও পরে লন্ডনে তাঁর ছবির প্রদর্শনী করেন। শিশুদের নিয়ে সুলতানের বহু স্বপ্ন ছিল। ১৯৫৩ সালে তিনি নড়াইলে ফিরে আসেন এবং শিশু শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। নড়াইলে তিনি 'নন্দন কানন' নামের একটি প্রাইমারি ও একটি হাই স্কুল এবং একটি আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। শিশুদের জন্য কিছু করার আগ্রহ থেকে তাঁর শেষ বয়সে তিনি 'শিশুস্বর্গ ও 'চারুপীঠ' প্রতিষ্ঠা করেন।

মধ্যপঞ্চাশে ঢাকায় আধুনিক চিত্রকলা নিয়ে প্রচুর কাজ হয়। সেসময় শিল্পীরা উৎসাহ ও আগ্রহে বিভিন্ন কৌশল-রীতি, নিয়ম, ও ছবির মাধ্যমসহ নতুন নতুন বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ে প্রচুর ব্যস্ত হয়ে উঠেন। সেসময়ও তিনি সকলের চোখের আড়ালে নড়াইলেই রয়ে গেলেন। মাঝে মাঝে ঢাকায় আসতেন কিন্তু তাঁর জীবনের মূল সুরটি ছিল গ্রামীণ জীবন, কৃষক ও কৃষিকাজের ছন্দের সঙ্গে বাঁধা। গ্রামীণ জীবন থেকেই তিনি আবিষ্কার করেছেন বাঙালি জীবনের উৎস কেন্দ্রটি, বাঙালির দ্রোহ ও প্রতিবাদ, বিপ্লব ও সংগ্রাম, নানান প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকার ইতিহাস, অনুপ্রেরণা। গ্রামীণ জীবনেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন বাঙালির ইতিহাস, সংস্কৃতি। তিনি কৃষক পুরুষকে দিয়েছেন পেশিবহুল ও বলশালী দেহ আর কৃষক রমণীকে দিয়েছেন সুঠাম ও সুডৌল গড়ন, দিয়েছেন লাবণ্য ও শক্তি। হয়ত তাঁর দেখা দুর্বলদেহী, ম্রিয়মাণ ও শোষণের শিকার কৃষকদের দেখে কল্পনায় তিনি নির্মাণ করেছেন শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যবান কৃষকসমাজ। তাঁর ছবিতে পরিপূর্ণতা ও প্রাণপ্রাচুর্যের পাশাপাশি ছিল শ্রেণিবৈষম্য, গ্রামীণ জীবনের কঠিন বাস্তবতার চিত্র। তাঁর আঁকা হত্যাযজ্ঞ (১৯৮৭) ও চরদখল (১৯৮৮) এরকমই দু'টি ছবি।

১৯৭৬ সাল পর্যন্ত সুলতান শিল্পরসিকদের দৃষ্টির আড়ালেই রয়ে যান। মধ্যসত্তরে তাঁর কিছু ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ী তাঁকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। ঢাকায় আঁকা তাঁর কিছু ছবি দিয়ে ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। মূলত এ প্রদর্শনীটিই তাঁকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়। এছবিগুলিই তাঁকে নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রতিনিধি ও তাদের নন্দনচিন্তার রূপকার হিসেবে পরিচিত করে। তাঁর ছবিতে কৃষকই হচ্ছে জীবনের প্রতিনিধি এবং গ্রাম হচ্ছে বিশ্বের কেন্দ্র। গ্রাম ও গ্রামের মানুষের মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর সৃষ্টির প্রেরণা। এজন্যই কৃষক ও তাদের জীবন একটি কিংবদন্তি শক্তি হিসেবে সকলের চোখে তাঁর ছবিতে উঠে এসেছে। অপূর্ব বাঁশি

বাজাতেন। বাজাতেন তবলা। শাড়ি পরে পায়ে ঘুঙুর পরে নাচতেন আপন খেয়ালে। বিশ্বখ্যাত কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় যখন তাঁকে 'ম্যান অব অ্যাচিভমেন্ট' সম্মাননা প্রদান করল তখনো তিনি বললেন, 'শিল্পের কখনো পুরস্কার হয় না। শিল্পের ভার তো প্রকৃতি স্বীয় হাতে প্রদান করে।'

সালটা ১৯৩৩। সেবছরই বিখ্যাত রাজনীতিবিদ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এসেছিলেন নড়াইলের ভিক্টোরিয়া কলেজিয়েট স্কুল পরিদর্শনে। সুলতান তাঁর একটি পেন্সিল স্কেচ এঁকেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ মাত্র ১০ বছর বয়সি এক বালকের আঁকা স্কেচ দেখে ভীষণ মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেই পেন্সিল স্কেচের মাধ্যমেই শিল্পী হিসেবে সুলতানের প্রথম আত্মপ্রকাশ।

গতানুগতিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কখনোই টানেনি সুলতানকে। তাই অষ্টম শ্রেণিতে পড়া অবস্থাতেই তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ইতি। একপর্যায়ে কলকাতা যাত্রা। উদ্দেশ্য আর্ট স্কুলে ভর্তি। চল্লিশের দশকের প্রথমভাগে আর্ট স্কুলের ভর্তি পরীক্ষায় ৪০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন সুলতান। পরীক্ষায় ১৫ মিনিট সময়ে আঁকতে দেয়া হয়েছিল ভেনাস ডি মিলোর ছবি।

এসময় আর্ট স্কুলে কামরুল হাসান, সফিউদ্দিন আহমেদের মতো কিংবদন্তি শিল্পীদের সহপাঠী হিসেবে পেয়েছিলেন সুলতান। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সেখানেও টানেনি সুলতানকে। তাই আর্ট স্কুলের তৃতীয় বর্ষে সেই যাত্রারও ইতি। ১৯৪৩-এ আর্ট স্কুল ছাড়লেন সুলতান। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাঁধাধরা জীবন এবং প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার কঠোর রীতিনীতি সুলতানের জীবনের সাথে কখনোই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এসময় সুলতান খাকসার আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তখন ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। অনেক মার্কিন ও ব্রিটিশ সেনা ছিল ভারতে। সুলতান ছোট-বড় বিভিন্ন শহরে ঘুরে ঘুরে ছবি এঁকে তা সেনাদের কাছেই বিক্রি করতেন। বেশ কয়েকটি শহরে প্রদর্শনী হয়েছিল তাঁর আঁকা চিত্রকর্মের। সুলতানের প্রথম প্রদর্শনী হয়েছিল ১৯৪৭ সালে শিমলায়। সেই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন কাপুরতলার মহারাজা।

দ্বিতীয় প্রদর্শনী হয়েছিল লাহোরে। সালটা ছিল ১৯৫০। উদ্বোধন করেছিলেন মালিক ফিরোজ খান নূন। একই বছরে করাচিতে হওয়া তাঁর আরেক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন ফাতেমা জিন্নাহ। এসময় সুলতান মার্কিন সরকারের আমন্ত্রণে মার্কিন মুলুক ঘুরে এলেন। বিলেতের লেইস্টার গ্যালারিতে তাঁর ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল পিকাসো, সালভেদর দালির চিত্রকর্মের সঙ্গে। সুলতানের জীবনমুখী ও বাংলার মায়াবি রূপের সেসব চিত্রকর্ম তুমুল আলোড়িত এবং প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু সুলতানের সেসব ছবি পরে আর পাওয়া যায়নি। এক সাক্ষাৎকারে সুলতান বলেছিলেন সেইসময়ে তাঁর জীবন নিয়ে, 'একেক জায়গায় এভাবে পড়ে আছে সব। শ্রীনগরে গেলাম। সেখানকার কাজও নেই। শ্রীনগরে থাকাকালীন পাকিস্তান হয়ে গেল। '৪৮-এ সেখান থেকে ফিরে এলাম। কোনো জিনিসই তো সেখান থেকে আনতে পারিনি। একটা কনভয় এনে বর্ডারে ছেড়ে দিয়ে গেল। পাকিস্তান বর্ডারে। আমার সমস্ত কাজগুলোই সেখানে রয়ে গেল। দেশে দেশে ঘুরেছি। সেখানে এঁকেছি। আর সেখানেই রেখে চলে এসেছি।'

১৯৫৩ সালে করাচি থেকে ঢাকায় ফেরেন সুলতান। সেখান থেকেও সবকিছু ছেড়ে চলে গেলেন সকলের অজ্ঞাতে নড়াইলের পুরুলিয়া গ্রামে। তখন তিনি ছবি আঁকা প্রায় ছেড়েই দিলেন। সত্তরের দশকের মাঝামাঝিতে কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীর আকুল প্রচেষ্টায় তাঁকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়।

১৯৭৫ সালে শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় প্রদর্শনীতে তিনি ছবি পাঠালেন। তাঁর ১৭টি তৈলচিত্র, জলরং, কালি কলমের স্কেচ ও চারকোলের চিত্রকর্ম নিয়ে ১৯৭৬ সালে শিল্পকলা একাডেমিতে বিশাল প্রদর্শনী হয়েছিল। সুলতান তখন নতুন এক রূপে আমাদের সামনে উন্মোচিত হলেন। ২২ বছর পর সুলতান জানালেন চিত্রশিল্পী হিসেবে তাঁর মৃত্যু। পুরুলিয়ায় সুলতানের অসংখ্য ছবি নষ্ট হয়েছে, সংরক্ষিত হয়নি। অসংখ্য ছবি বৃষ্টিতে ভিজে ও রোদে পুড়ে নষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে অনেক ছবি দেশে-বিদেশে ফেলে এসেছিলেন। যার প্রতিটিই ছিল আমাদের চিত্রকর্মের ইতিহাসে অমূল্য সম্পদ।

সুলতানের ছবিতে আমরা দেখি গ্রামবাংলার নতুন এক প্রতিচ্ছবি। একই সাথে তাঁর এ ছবিগুলোতে গ্রামীণ প্রেক্ষাপটের শ্রেণি-দ্বন্দ্ব এবং গ্রামীণ অর্থনীতির ক্রূর বাস্তবতাও উঠে এসেছে। সুলতানের ছবিতে আমরা দেখতে পাই পেশিবহুল কৃষকের ছবি, দেখতে পাই বলিষ্ঠ আকার। এই নিয়ে জবাবটা সুলতান নিজেও দিয়েছিলেন। সুলতান বলেছিলেন, 'আমাদের দেশের মানুষ তো অনেক রুগ্ন, কৃষকায়। একেবারে কৃষক যে সেও খুব রোগা, তার গরু দুটো, বলদ দুটো- সেটাও রোগা। আমার ছবিতে তাদের বলিষ্ঠ হওয়াটা মনের ব্যাপার।

মন থেকে ওদের যেমনভাবে আমি ভালোবাসি যে আমাদের দেশের কৃষক সম্প্রদায়ইতো ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়েছিল। অর্থবিত্ত ওরাইতো যোগান দেয়। ...আর এই যত জমিদার রাজা মহারাজা আমাদের দেশের কম কেউ না। সবাইতো কৃষিনির্ভর একই জাতির ছেলে। আমার অতিকায় ছবিগুলোর কৃষকের অতিকায় দেহটা এই প্রশ্নই জাগায় যে, ওরা কৃশ কেন? ওরা রুগ্ন কেন- যারা আমাদের অন্ন যোগায়- ফসল ফলায়।'

গবেষণা করে জানা যায়, শিল্পী সুলতান আধুনিক ও নিরবয়ব শিল্পের চর্চা করেননি। তাঁর আধুনিকতা ছিল জীবনের অবিনাশী বোধ ও শিকড়ের শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করা। উপনিবেশিকোত্তর সংগ্রামের নানা প্রকাশকে তিনি সময়ের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তুলে ধরেছেন। এটিই তাঁর দৃষ্টিতে আধুনিকতা। তিনি ইউরোকেন্দ্রিক, নগরনির্ভর, যান্ত্রিকতা-আবদ্ধ আধুনিকতার পরিবর্তে অনেকটা ইউরোপের রেনেসাঁর শিল্পীদের ন্যায় খুঁজেছেন মানবের কর্ম-বিশ্বকে। সুলতানের মতো আর কেউ আধুনিকতার এমন ব্যাখ্যা দেননি। তাঁর অনন্য স্টাইলটি অনুকরণীয়। তাঁর কোনো অনুসারী বা স্কুল নেই, তাঁর মতো মাটির কাছাকাছি জীবন তাঁর সময়ে আর কোনো শিল্পী যাপন করেননি। সুলতান তেলরঙ ও জলরঙের ছবি এঁকেছেন। ব্যবহার করেছেন সাধারণ কাগজ, সাধারণ রঙ ও চটের ক্যানভাস।

আশির দশক থেকে সুলতান নড়াইলে থেকে যেতে অনেকটা বাধ্য হয়েছিলেন। এস এম সুলতানের পোষা বেশ কয়েকটি বিড়াল ছিল। তাঁর কাছে যেসব মানুষ এবং শিশু আশ্রয় নিয়েছিল তাদের জন্য তিনি নিজের ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন। একসময় সুলতান শিশুদের জন্য একটি বড় কাঠের নৌকাও তৈরি করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল শিশুরা সেই নৌকায় চড়ে সমুদ্র পরিভ্রমণে বের হবে আর শিল্পচর্চার উপকরণ খুঁজে পাবে। সুলতান বলতেন, 'যে শিশু সুন্দর ছবি আঁকে, তার গ্রামের ছবি আঁকে, সে সুন্দর ফুলের ছবি আঁকে, তার জীবজন্তুর ছবি আঁকে, গাছপালার ছবি আঁকে, সে কোনোদিন অপরাধ করতে পারে না, সে কোনোদিন কাউকে ব্যথা দিতে পারে না।' সুলতান দ্বিধাহীনভাবে অকপটে বলতেন, 'আমি সুখী। আমার কোনো অভাব নেই। সকল দিক দিয়েই আমি প্রশান্তির মধ্যে দিন কাটাই। আমার সব অভাবেরই পরিসমাপ্তি ঘটেছে।'

১৯৮৭ সালে ঢাকার গ্যেটে ইনস্টিটিউটে সুলতানের একটি প্রদর্শনী হয়। আশির শেষদিকে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে। ১৯৯৪ সালে ঢাকার গ্যালারি টোন-এ তাঁর শেষ প্রদর্শনীটি হয়। সেবছর আগস্ট মাসে ব্যাপক আয়োজন করে তাঁর গ্রামের বাড়িতে তাঁর জন্মদিন পালন করা হয়। এর পরপরই ১৯৯৪ সালের ১০ অক্টোবর যশোর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। বাংলার মাটি ও মানুষের শিল্পী এস এম সুলতানের মৃত্যুবার্ষিকী সামনে রেখে তাঁর প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও গবেষক

বিষণ্ন শহর

সাবরিনা নিপু

সন্ধ্যা নামছে শহরতলীতে
আশপাশের নিয়মশূন্য বাড়ি ঘরের
ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে থাকা
জ্যামিতিক আকাশের রং
গাঢ় হচ্ছিল ক্রমশঃ
দোতলার ছাদে দাঁড়িয়ে থেকে
পথচারীদের অস্ফুট কথাবার্তা
শুনছিলাম স্পষ্ট।
হঠাৎ শুনতে পেলাম
পাশের বাড়ির ছাদে
কেউ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে
মনটা বিষণ্ন হয়ে গেল মুহূর্তেই
এত বিষাদ কেন চারিদিকে?
ভাবলাম, ডেকে জিজ্ঞেস করি
কিন্তু মনে পড়ল, কোথায় যেন পড়েছি
কেউ একা নির্জনে কাঁদলে
তাকে জিজ্ঞেস করতে নেই তার কারণ কী?
বরং কাঁদতে দেয়া উচিত।

আমাদের প্রত্যেকের
একান্ত নিজস্ব কিছু কষ্ট থাকে
চিরদিনের ভুল বোঝাবুঝি আর
জমানো অভিমানে
কষ্টগুলো বেড়েই চলে রোজ
একদিন সব কষ্ট পেরিয়ে যাব ভেবে
একপা দু'পা করে এগোই
আবার পিছিয়ে আসি
কষ্টকে টপকাতে পারি না কিছুতেই
কত কত রৌদ্র পার করে
জমে এতটা শ্রাবণ
কেউ কি তার হিসেব রাখে?
হঠাৎ সম্বিত ফিরতেই দেখি
রাস্তার কোলাহল থেমে গেছে
দেখা যাচ্ছে না পাশের বাড়ির মেয়েটিকেও
শুধু খোলা আকাশের নীচে
দাঁড়িয়ে রয়েছি একা
দেখলাম নীল, নির্জন, নিভৃত নম্র
রাত নামছে বিষণ্ন শহরে।

অসমাপ্ত সোলেনামা

মহসিন আহমেদ

রসালো ফলের ন্যায় দহনকালের সীমারেখা
অসমাপ্ত সংগীতের আদিম পুরাণে ধ্যানরত
শৈল্পিক বয়ানে লেখা খোলা চোখে যায় না-তো দেখা
সহস্র সাধক আজ অনুমান বিন্দুতে আহত

ঢেউফল মিলনের ত্রিবেণী পরেছে মধুরাতে
ত্রিফলার নির্যাসেও আরোগ্য রচনা হতে পারে
তাম্রলিপি থেকে যদি অনুসন্ধানী আকল হাতে
উদ্ধার হয় কখনো তিয়াসাযুক্ত মরুমিনারে

থানকুনি রস যদি জীবনের গতি খুঁজে ফেরে
ত্রিশূলে বাড়ায় জানি রক্তের সমূহ গতিকলা
দরোজার খিল ভেঙে সহসাই বলে উঠি কে রে?
তরঙ্গের মহিমায় চাইলেও যায় না তো চলা

ত্রিপদী পাঠের কালে শোষকের তিরোধান হলে
তপোবন জেগে ওঠে, পড়ে থাকে অসমাপ্ত সোলেনামা
শালবনে অনায়াসে অবিরাম বহ্নিশিখা জ্বলে
পাহাড়ের গুহা থেকে ভেসে আসে দারুণ দামামা।

ছাতা

সুনেত্রা বড়ুয়া

এক সপ্তাহ আগে সেলাই করা নতুন প্যান্টটা হাঁটু অবধি গুঁজে জুতো জোড়া একহাতে আর অন্যহাতে শিকভাঙ্গা ছাতাটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন হাসান সাহেব। অভিমানী আকাশ যেন আজকেই তার ক্রন্দনবারি সবটুকু ধরিত্রীমাতাকে বিসর্জন দেবে। পুরো শহর জুড়ে কোমর অবধি পানি জমে যাচ্ছেতাই অবস্থা। এই অবস্থায় বাসায় পৌঁছতে গাড়ি পাওয়া বিড়ম্বনার আরেক নাম। বিগত দেড়ঘণ্টা যাবত পথের দিকে আকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি। পানি ঠেলে রিক্সাগুলো একে অন্যকে ধাক্কা দিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে। জলপথেও যে স্থলযান চলা সম্ভব এই বোধহয় তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। শত বিরক্তির মাঝেও হাসান সাহেব মনে মনে হাসলেন। রাস্তার পাশের দোকানগুলোতে একহাঁটু পানি। দোকানিরা আস্তে আস্তে ঝাঁপি ফেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর কিছুক্ষণ পর থেকে শুধু দোকানের নামফলকগুলো নিষ্প্রাণ শহরে জীবন্ত হয়ে থাকবে।

নাহ! আজ বড্ড বেশি দেরি হয়ে গেছে। বাসায় নিতু আর বাচ্চারা নিশ্চয়ই চিন্তা করছে।

পরীক্ষার আগের সময়টাতে টিউশনে একটু বেশি সময় পড়াতে হয়। গণিতের শিক্ষক হিসেবে তার ভীষণ জনপ্রিয়তা আছে এলাকায়। সেই সুবাদে অনেকগুলো টিউশন করেন তিনি। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর ছেলেমেয়েগুলো যখন বলে "স্যার আপনার জন্যই গণিতে ভালো করলাম" তখন তার পরিতৃপ্তির সীমা থাকে না। শিক্ষক হবার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি বোধহয় এটাই।

অনেক পুরনো ছাত্রকে দেখে তিনি প্রায়শই চিনতে পারেন না। তারা কৈশোর পার করে যৌবনে পদার্পণ করেছে। শারীরিক অবয়বের সাথে অনেকের ব্যক্তিত্বেও পরিবর্তন এসেছে। তাদের এ পরিবর্তন হাসান সাহেবের খুব ভালো লাগে।

নাহ! আর কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কে জানে!

পাশের হোটেল থেকে ভেসে আসা খাবারের সুঘ্রাণ তার খিদেটাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। হোটেলের নামফলকের দিকে চোখ পড়তেই আঁতকে উঠলেন তিনি। 'হা রেস্তোরাঁ' এটা আবার কেমন নাম! ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন 'ড়ি'-এর লাইটটা নষ্ট হয়ে গেছে। মনে-মনে আরেক দফা হাসলেন হাসান সাহেব। একটা অক্ষরের কত শক্তি! পুরো শব্দের মাধুর্যতাই বদলে হাস্যকর করে তুলেছে।

হোটেলের ভেতর বেঞ্চির উপর পা তুলে বসে একলোক পত্রিকা পড়ছে। ওপরের পাতায় খবরের শিরোনামে হাসান সাহেবের চোখ আটকে যায়। 'ছাত্রের স্ট্যাম্পের আঘাতে গুরুতর আহত শিক্ষকের মৃত্যু।'

হাসান সাহেবের অজান্তেই তাঁর মেরুদণ্ডের শিরদাড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে যায়। তিনি চোখ সরিয়ে অন্যদিকে দৃষ্টি দেওয়ার চেষ্টা করেন। তার মাথার ভেতরটা শূন্য লাগছে। বাতাসের বেগ তার ভাঙ্গা ছাতাটা উড়িয়ে নিতে চাইছে। শক্ত করে ছাতাটা তিনি আঁকড়ে ধরে থাকেন। তার মনে হতে লাগল ওই আহত শিক্ষকটি তো তিনিও হতে পারতেন।

হাসান সাহেবের মনে পড়ে যায়, গত সপ্তাহে তিনি তার ছোটবেলার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের জানাজায় অংশ নেবার পর অঝোরে কেঁদেছিলেন। কারণ হাসান সাহেবের উচ্চশিক্ষার যাত্রাটা তার প্রধান শিক্ষকের হাত ধরেই হয়েছিল। জীবনের এই পর্যায়ে এসেও তিনি তার শিক্ষকদের অবদান অস্বীকার করতে পারেন না।

হঠাৎ মোটরসাইকেলের হর্ন এর শব্দে তার চিন্তায় ছেদ পড়ল।

- স্যার ভালো আছেন? আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমি রুদ্র। এসএসসি ২০০২ ব্যাচ। মাথার হেলমেট খুলে গোলগাল চেহারার এক তরুণ হাসিমুখে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

- হাসান সাহেব একটু বিব্রতবোধ করেন। নামটা চেনা মনে হলেও ছেলেটার আগের অবয়ব তিনি কিছুতেই মনে করতে পারেন না।

গলায় অস্বস্তি নিয়েই উত্তর দেন, ভালো আছি। তুমি ভালো?

- হ্যাঁ স্যার। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন বোধহয়। পেছনে উঠে বসেন। আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

হাসান সাহেব ঘড়ি দেখলেন, রাতের ১০:৩০। বিব্রতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাসা কোথায় বাবা?

- মুরাদপুর স্যার, জিএসিতে একটা কাজ ছিল তাই এদিকে আসা। তাড়াতাড়ি উঠুন স্যার। বৃষ্টির বেগ বাড়ছে।

হাসান সাহেব আবার বিব্রতবোধ করতে থাকেন, সেকি! আমিতো চৌমুহনী যাব। তোমার বাসাতো উল্টোপথে। থাক, তুমি বরং বাসায় যাও বাবা। অনেক রাত হয়ে গেছে, ঘরের মানুষ চিন্তা করবে।

ছেলেটা এবার হাত ধরে টেনে জোর করে বাইকের পেছনে বসিয়ে দিল হাসান সাহেবকে।

- স্যার শক্ত করে বসেন। রাস্তার যা অবস্থা!

হাসান সাহেব কী বলবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। পানি ঠেলে একটু একটু করে তারা এগিয়ে যেতে থাকে।

অনেকক্ষণ হাসান সাহেব কিছু বলার জন্য খুঁজে পাচ্ছিলেন না। মৌনতা ভেঙে ছেলেটি আবার প্রশ্ন করে, স্যার বোধহয় এখনো আমাকে চিনতে পারেননি! ওই যে স্যার, আমি আর শুভ টিফিনে স্কুলের পেছনে লুকিয়ে সিগারেট খেতে গিয়ে আপনার হাতে ধরা পড়েছিলাম। আপনি আমাদের দুজনকে খুব মেরেছিলেন।

এবার হাসান সাহেবের স্মৃতিতে ছবির মত সবকিছু ভেসে ওঠে। ক্লাসের সবচেয়ে দুষ্টুছেলে শুভ আর রুদ্র। স্কুলের সকল দস্যিপনার নাটের গুরু ছিল এই দুজন। তাদের কীর্তিকলাপ মনে করে মনে মনে আরেক দফা হাসলেন হাসান সাহেব।

এবার তিনি মৌনতা ভেঙে ছেলেটার কাঁধে আলতো করে হাত রাখলেন।

- মনে পড়েছে বাবা। তোমরা কেউ তো আর আগের মতো নেই, তাই হঠাৎ চিনতে পারি না। কিছু মনে করো না।

এবার রুদ্র হো হো করে হেসে ওঠে। কি যে বলেন স্যার! শুভর সাথে কথা হলেই আপনার কথা মনে পড়ে। পরীক্ষার্থীদের সবাইকে পরীক্ষার আগে যে কলমগুলো উপহার দিয়েছিলেন, আমি আর শুভ আমাদের কলম দুটো যত্ন করে রেখে দিয়েছি। ও হ্যাঁ! আপনি স্যার আমাকে আর শুভকে সিগারেট নিয়ে বরাবরই সন্দেহ করতেন, কিন্তু সেদিনের পর থেকে আমরা আর সিগারেট খাইনি স্যার।

এবার হাসান সাহেব আর রুদ্র দুজনেই হো হো করে হেসে ওঠে। যানবাহনের শব্দে তাদের হাসির বেগ বেশিদূর পৌঁছতে পারে না।

মোটরসাইকেল যখন হাসান সাহেবের বাসার সামনে থামল, তখন ঘড়িতে এগারোটা বেজে দশ মিনিট।

হাসান সাহেব ছেলেটাকে বলতে যাচ্ছিলেন, ভেতরে চলো। তার আগেই রুদ্র বলল, স্যার চলুন আপনার বাসা থেকে ঘুরে আসি।

হাসান সাহেব ছাতাটা বন্ধ করতে করতে একটু হাসলেন।

বেল বাজাতেই রাফি এসে দরজা খুলে দিল। রাফি হাসান সাহেবের ছোটছেলে। এবার অনার্স ফাস্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছে।

জুতো জোড়া তাকের উপর রেখে, মানিব্যাগ আর ছাতাটা রাফির দিকে এগিয়ে দিলেন।

- মাকে গিয়ে বল আমার এক ছাত্র এসেছে।

রুদ্রকে ড্রয়িংরুমে বসতে দিয়ে তিনি ভেতরে গেলেন। যাবার সময় স্ত্রী নিতুকে ডেকে বললেন ছেলেটাকে কিছু খেতে দাও।

ভেতর থেকে ফ্রেশ হয়ে এসে দেখলেন, রুদ্র যাবার জন্য তৈরি হয়ে আছে। হাসান সাহেবকে দেখে একটা মৃদুহাসি হেসে বলল, স্যার আজ তবে আসি। অনেক রাত হয়ে গেছে। সামনে থাকা টেবিলের ওপর মানিব্যাগ থেকে একটা কার্ড রেখে বলল, স্যার আমার কার্ড রইল দরকার হলেই ফোন করবেন।

গেটের বাইরে পর্যন্ত রুদ্রকে এগিয়ে দিয়ে এলেন হাসান সাহেব। মোটরসাইকেলের লাইটটা হারিয়ে যাবার আগপর্যন্ত সেদিকে চেয়ে রইলেন তিনি। হাসান সাহেবের বুকের ভেতর থেকে নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

ধীরে ধীরে দরজাটা লাগিয়ে ড্রয়িংরুমের সোফায় গা এলিয়ে দেন তিনি। টেবিলের ওপর রাখা রুদ্রের ভিজিটিং কার্ডটা তুলে নেবার সময় লক্ষ্য করলেন টেবিলের কোনায় একটা প্যাকেট করা নতুন ছাতা।

- ইশ্! ছেলেটা এই বৃষ্টিতে ছাতাটা ফেলে গেছে। দ্রুত কার্ড থেকে নম্বরটা খুঁজে নিয়ে কল করেন তিনি। দুবার রিং হতেই রুদ্র ফোন রিসিভ করে।

- হ্যালো!

- রুদ্র, আমি হাসান স্যার বলছি।

- জি স্যার!

- তোমার ছাতাটা তো ফেলে গেছ বাবা!

- না স্যার, ওটা আপনার। দূর থেকে দেখছিলাম আপনার ছাতাটা ভেঙে গেছে। আপনাকে ডাক দেবার আগেই মোড়ের ছাতার দোকান থেকে ছাতাটা কিনেছি। কেনার সময় আপনাকে চোখে চোখে রেখেছিলাম স্যার। এই না আবার আপনি কোন গাড়িতে উঠে পড়েন। তাহলে তো আর আপনার সাথে যেতে পারতাম না।

বলেই ছেলেটা আবার হাসছে।

হাসান সাহেব বলার জন্য কিছু খুঁজছিলেন। রুদ্র আবার মৌনতা ভাঙল। সামনের বুধবার সুইডেন চলে যাচ্ছি স্যার। দোয়া করবেন।

- আচ্ছা বাবা ভালো থেকো। না চাইলেও শিক্ষকদের দোয়া সবসময় তোমাদের সাথে থাকবে।

ফোনটা রেখে ছাতাটার দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি। আসার সময় দেখা খবরের কাগজের হেডলাইনটা তার স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে আসে। বাইরে তখন অঝোরে বৃষ্টি। শহরের আবর্জনাগুলো ধুয়ে যাচ্ছে। এভাবে মনের আবর্জনাগুলো যদি ধুয়ে ফেলা যেত!

হাসান সাহেব দুহাত তুলে তার ছাত্রদের জন্য দোয়া করেন।

লেখক: শিক্ষক ও কথাসাহিত্যিক

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স.)

মাওলানা হাফেজ কাজী মারুফ বিল্লাহ্

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবি ও রসুল আদর্শ মহামানব বিশ্বনেতা, বিশ্বনবি, মানবতার মহান শিক্ষক পরম বন্ধু রহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মদ (স.)। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন যেমন পূর্বে নাজিলকৃত সব আসমানি কিতাবের যাবতীয় কল্যাণকর বিষয়াবলির সার-নির্যাসের সমন্বিত আসমানি কিতাব, ঠিক তেমনি পূর্বে প্রেরিত সকল নবি রসুলের জীবনে বিদ্যমান সব মানবিক ও নৈতিক গুণাবলির সমাবেশ ঘটেছিল বিশ্বনবির জীবনে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্বয়ং তার শ্রেষ্ঠ চরিত্রের সত্যতার সনদ প্রদান করেছেন মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে, '(হে মুহাম্মদ)! নিশ্চয় আপনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী।'- (সূরা আল কলম: ৪)

আল্লাহর রসুল (স.) বলেন, 'উত্তম চরিত্রের গুণাবলিকে পরিপূর্ণতা দান করার জন্যই আমি নবি হিসেবে প্রেরিত হয়েছি ।

মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সকল প্রকার মানবিক গুণে গুণান্বিত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। শত্রু-মিত্র সকলের মুখে সমভাবে তাঁর অনুপম চরিত্র-মাধুর্যের ভূয়সী প্রশংসা বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামের কট্টর দুশমন আবু সুফিয়ান পারস্য সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট অকপটে বিশ্বনবির সততা, আমানতদারি ও সচ্চরিত্রতার উচ্চ প্রশংসা করেছেন (বুখারি শরিফ)।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রসুলের জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম গ্রহণযোগ্য আদর্শ, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিক হারে আল্লাহকে স্মরণ করে'। (সূরা আযহাব: ২১)

বিশ্বনবি ও ইসলামের চরম দুশমন আবু জেহেল তাঁর সত্যবাদিতার স্বীকৃতি দিতে গিয়ে বলেছে, 'মুহাম্মদ! আমরাতো তোমাকে মিথ্যা মনে করি না, বরং তোমার আনীত ওহিকে মিথ্যা মনে করি।' ধূলিঝড়ের দিন যখন আল্লাহর রসুল (স.) তাঁর নিকট ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছেন, তখন আবু জেহেল স্ববিরোধী কথা বলেছিল, তা হলো, 'ভাতিজা! তুমি যে দাওয়াত দিচ্ছ, তা তো সত্য কথা, আমি যদি তা গ্রহণ করি তবে তোমাকে নেতা মানতে হবে। আমার নেতৃত্ব আর থাকবে না। তাই তোমার দাওয়াত কবুল করা

আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর অতুলনীয় অনুপম আর্কষণীয় চরিত্র মাধুর্য পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করা এমন অসম্ভব, যেমন খালি চোখে আকাশের তারকা গণনা করা অসম্ভব।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি তাঁর পূণ্য জন্মভূমি পবিত্র মক্কায় ১৩ বছর একদল যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি করেন। পরবর্তীতে মক্কায় সমর্থন না পেয়ে মক্কার তৈরি লোক দিয়ে মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম ও কুরআনের আইন বিজয়ী করে উদ্দেশ্য সফল করেন এবং বিশ্ববাসীকে সোনালি যুগ উপহার দেন।

বিশ্বনবি (স.) এর চরিত্র মাধুর্য

বাল্যকাল থেকেই তাঁর স্বাভাব ছিল মিষ্টি মধুর, যাবতীয় কলুষতা, কাঠিন্য-কর্কষতা ও অহংকারমুক্ত। তিনি ছিলেন দয়াশীল, লজ্জাশীল, শ্রদ্ধাশীল, সহানুভূতিশীল ও উদার মহামানব। শৈশবকাল থেকেই তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ। সারাজীবনে কোনদিন একটি মিথ্যাও বলেননি। তাই আরবের বর্বর জাহেলরাও তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন 'আস-সাদিক' বলে।

রাষ্ট্রপতি, সেনাপতি, বিচারপতি, প্রশাসক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, চিকিৎসক, সমাজপতি, সমাজসেবক, সংস্কারক, শ্রমিক, গৃহকর্তা, ধনী-নির্ধন এককথায় সর্বমহলের জন্যই একমাত্র, কেবলমাত্র, শুধুমাত্র মুহাম্মাদ (স.)-ই অনুসরণযোগ্য আদর্শ। তাঁর চারিত্রিক গুণাবলি কিয়ামত পর্যন্ত লিখেও শেষ করা যাবে না। নিম্নে সামান্য ক'টি চারিত্রিক গুণের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করছি-

১. মুহাম্মদ (স.) সবাইকে আগে সালাম দিতেন:

ছোট-বড়, ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ, পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে তিনিই সর্বপ্রথম সালাম দিতেন। কেউ কখনো তাঁকে আগে সালাম দিতে পারেনি। একদিন হযরত আয়েশা (রা.) বিশ্বনবিকে আগে সালাম দেওয়ার উদ্দেশ্যে দরজার আড়ালে আত্মগোপন করে আছেন, কিন্তু রসুল (সা.) আগেই তাঁকে সালাম দিয়ে দিলেন। মহানবি (সা.)-কে রাস্তা দিয়ে চলতে দেখলে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা মাঠে খেলাধুলা রেখে তাঁকে সালাম দেওয়ার জন্য দৌড়ে আসতো, আল্লাহর রাসুল তাদের আগেই সালাম দিয়ে দিতেন। কথা বলার আগে সালাম দেওয়ার জন্য তিনি উপদেশ দিতেন ও বেশি বেশি সালাম প্রদান ও মানুষকে আহার করানোর নিদের্শ দিতেন এবং এটাকে জান্নাত লাভের উপায় বলতেন। তিনি বলেন, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না মুমিন হও, আর ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না, যতক্ষণ না একে অপরকে ভালোবাস, আর ভালোবাসা কীভাবে তৈরি হবে, আমি কি তোমাদের বলে দেব? তোমরা পরস্পরকে সালাম দেবে, সালামে ভালোবাসা পয়দা হবে, আর ভালোবাসা জান্নাতে পৌঁছাবে।'

২. তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়

আল্লাহর রসুল (স.) গোপনে ও প্রকাশ্যে সবার চেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করতেন। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত- হযরত রসুলে করিম (স.) (বিশেষ লোকদের উদ্দেশে) বলেন, 'আল্লাহ সম্পর্কে আমি তোমাদের সবার চেয়ে বেশি অবগত এবং আল্লাহকে আমি তোমাদের সকলের চেয়ে বেশি ভয় করি। (বুখারি শরিফ) তিনি আল্লাহর সবচেয়ে পূর্ণ অনুগত ছিলেন। তিনি সর্বাধিক আমলে সালেহ করতেন ও হুবহু আল্লাহর হুকুম (আদেশ-নিষেধ) মেনে চলতেন।

আল্লাহর ভয়ে তিনি শেষরাতে সিজদায় পড়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় ও নিজের জন্য এবং উম্মতের মাগফিরাতের জন্য বেশি বেশি কাঁদতেন।

৩. দানশীলতা

পৃথিবীতে সর্বাধিক দানশীল, উদার ও বিরাট হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন বিশ্বনবি (স.)। হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, 'আল্লাহর রসুল (স.) এর নিকট কিছু চাওয়া হলে তিনি না করতেন না। (মুসলিম শরিফ)। হযরত মালেক বিন আ'নাস (রা.) বলেন, রসুল (স.) এর নিকট কিছু চাইলে, আল্লাহর রসুল (স.) দু'পাহাড়ের মাঝখানে তাঁর যত ছাগল ছিল সব প্রার্থীকে দিয়ে দিলেন। সেসব ছাগল নিয়ে বাড়ি গিয়ে তার গোত্রের লোকদের বললেন, তোমরা ইসলাম কবুল কর; কারণ মুহাম্মদ এমন দান করেন, গরিব হওয়ার ভয় করেন না। যতক্ষণ তাঁর কাছে কিছু থাকত ততক্ষণ তা দান করতেন। না থাকলে কারো কাছ থেকে নিয়ে দান করতেন অন্যথায় প্রার্থীর নিকট থেকে সময় নিয়ে তাকে পরবর্তীতে দিতেন। রমজানে তাঁর দান ছিল প্রবাহমান বায়ুর মতো। তিনি সদকা গ্রহণ করতেন না, কিন্তু হাদিয়া নিতেন। অথচ তা নিজ প্রয়োজনে যৎসামান্যই ব্যয় করতেন, সবই দান করে দিতেন। তিনি বলেন, কেউ ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ সে নিজের জন্য যা

পছন্দ করে, তা সে অন্যের জন্য পছন্দ না করবে। (বুখারি ও মুসলিম শরিফ) তিনি আরও বলেন, কোন বান্দার হৃদয়ে ঈমান ও কৃপণতা একসাথে থাকতে পারে না। (তিরমিযি ও নাসাই শরিফ)। তাঁর বক্তব্য ছিল, 'পাহাড়সম সম্পদও যদি আমার নিকট জমা থাকে, তা তিন দিনের বেশি আমার নিকট জমা থাকা আমি পছন্দ করি না।'

৪. বিনয় ও নম্রতা

আল্লাহর রসসুল (স.) ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী নম্র-ভদ্র ও নিরহংকার চরিত্রের মানুষ। তিনি জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে মানুষ হিসেবে সম্মান করতেন। একদিন তাঁর পাশ দিয়ে এক ব্যক্তি লাশ নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি দাঁড়িয়ে লাশকে সম্মান জানালেন। লোকেরা বলল, এ তো ইহুদির লাশ। আল্লাহর রসুল (স.) জবাব দিলেন, সে তো মানুষ। তিনি উঁচু-নিচু, সাদা-কালো আশ্রাফ-আতরাফের দেয়াল চিরতরে খতম করে দিয়েছেন। তাকে দেখে সম্মানার্থে দাঁড়াতে সাহাবিদের নিষেধ করতেন (তিরমিযি শরিফ)। মুসলমানদের কোনো সভায় উপস্থিত হলে যেখানে জায়গা পেতেন, সেখানেই বসে যেতেন। বিশেষ আসনে বা স্থানে বসার বা যাবার জন্য অপেক্ষা বা চেষ্টা করতেন না। অধীনস্থদের কোনো কাজে অসন্তুষ্ট হতেন না ও বিরক্ত প্রকাশ করতেন না এবং শুধু তাদেরই নয়, বরং কারো সাথেই কখনো অহংকার করতেন না। নবিজি (স.) বলেন, সবচেয়ে বড় গুনাহ নিজেকে বড় মনে করা, আর সবচেয়ে বড় নেকি নিজেকে ছোট মনে করা।

৫. লজ্জাশীলতা

তিনি পর্দাশীল কুমারী মেয়েদের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। আবু সাঈদ (রা.) বলেন, যখন তিনি সবকিছু পছন্দ করতেন, তখন তাঁর চেহারা দেখে বুঝে নিতাম। (বুখারি ও মুসলিম শরিফ)

কারো কোন মন্দ কাজ দেখলে তাকে সরাসরি মন্দ না বলে সাধারণভাবে নিষেধ করতেন, যাতে লোকটি লজ্জা না পেয়ে সে নিজেই সংশোধন হয়ে যায়। রসুল (স.) দৃষ্টি সর্বদাই অবনত রাখতেন, কখনোই অন্যের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন না। তিনি কারো মুখের ওপর কোন অপছন্দনীয় কথা বলতে লজ্জা পেতেন।

৬. সেবাপরায়নতা

কেউ অসুস্থ হলে তিনি তাঁর বাড়িতে গিয়ে সেবা করতেন ও সান্ত্বনা দিতেন। রোগীর জন্য দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ! তাকে এমনভাবে সুস্থ করুন যেন তার মধ্যে কোন রোগের নামচিহ্ন না থাকে।' কী খেতে মন চাইতো শুনে ক্ষতিকর না হলে তা দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এক বুড়ি রসুল (সা.) এর পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখতেন। রসুল (স.) এর পায়ে কাঁটা ফুটলে সে খিলখিল করে হাসত। এ বুড়ি অসুস্থ হলে তিনি তার সেবা করে সুস্থ করে তোলেন। এক ইহুদি ছেলে অসুস্থ হলে তিনি তার বাড়িতে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেন ও তার পরিচর্যা করেন। এ সময়ে তিনি বলেন, 'তুমি ইসলাম কবুল কর।' তখন সে তার বাবার দিকে তাকাল, সে তার নিকট বসা ছিল। তার বাবা তাকে বলল, তুমি আবুল কাসেমের কথা মেনে নাও। তখন ছেলেটি কালেমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম কবুল করল। অতঃপর মারা গেল। এরপর রসুল (স.) বের হবার সময় বলেন, 'আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, যিনি তাকে আমার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন।' (আবু দাউদ ও বুখারি শরিফ)

৭. শত্রুকে ক্ষমা করা

আল্লাহর রাসূল (স.) কাফেলা নিয়ে নজদের দিকে যাচ্ছিলেন। ক্লান্তি দূর করার জন্য যাত্রাবিরতি দিলেন। সাহাবাগণ বিভিন্ন গাছের নিকট বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। রসুল (সা.)-ও একটু দূরে গাছের নিচে শুয়ে পড়লেন। তরবারিটি পাশে রাখলেন। এমন সময় দুশমন এসে হাজির হলো। সে পাশে থাকা তরবারিটি কোষমুক্ত করে বলল, হে মুহাম্মদ! এখন কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? আল্লাহর রসুল (স.) দৃঢ়কণ্ঠে শান্তভাবে জবাব দিলেন, 'আল্লাহ'। এ কথা শুনে তরবারিটি তার হাত থেকে পড়ে গেল। আশপাশ থেকে সাহাবারা এসে জড়ো হলেন। দুশমন ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু আল্লাহর রসুল তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন (মুসলিম শরিফ)। মক্কা বিজয়ের পর সকল মক্কাবাসীকে নিঃশর্ত ক্ষমা করে দিলেন। ক্ষমা রসুল (স.) এর সবচেয়ে বড় গুণ ছিল।

৮. সবার সঙ্গে মিলেমিশে কাজ

কোনো এক সফরে যাত্রাবিরতি হলো, ছাগল জবাই হলো- খাবার প্রস্তুত করতে হবে। সাহাবাগণ নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন কাজ ভাগ করে নিলেন। আল্লাহর রসুল (স.) জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে লাকড়ি জোগাড় করার দায়িত্ব নিলেন। সাহাবাগণ নিজেরাই সব কাজ করবেন বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে রসুল (স.) বলেন, 'সকলের মাঝে নেতা হয়ে বসে থাকা আমি পছন্দ করি না।'

বাল্যকাল থেকেই তাঁর স্বাভাব ছিল মিষ্টি মধুর, যাবতীয় কলুষতা, কাঠিন্য-কর্কষতা ও অহংকারমুক্ত। তিনি ছিলেন দয়াশীল, লজ্জাশীল, শ্রদ্ধাশীল, সহানুভূতিশীল ও উদার মহামানব। শৈশবকাল থেকেই তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ। সারাজীবনে কোনদিন একটি মিথ্যাও বলেননি। তাই আরবের বর্বর জাহেলরাও তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন 'আস সাদিক' বলে

এক পাহলোয়ান অনেক বড় বড় পাথর উত্তোলন করেছে; আর জনগণ তাকে বীর বলে বাহবা দিচ্ছে। আল্লাহর রসুল (স.) বলেন, 'প্রকৃত বীর ঐ ব্যাক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে।' (বুখারি শরিফ)

৯. ব্যক্তিগত কারণে তিনি প্রতিশোধ নিতেন না

একবার খায়বারের ইহুদিরা আল্লাহর রসুল (স.)-কে খাবারের দাওয়াত দিয়ে জনৈক ইহুদি মহিলা খাবারে বিষ মিশিয়ে দিল। রসুল (স.) ওহি মারফত জানলেন; কিন্তু কোনো প্রতিশোধ নিলেন না, তিনি মহিলাকে ক্ষমা করে দিলেন। শত্রুকে ক্ষমা করে দেওয়ার এরূপ অসংখ্য ঘটনা তাঁর জীবনে রয়েছে।

১০. হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন পরশপাথর

মহান আল্লাহ তাঁকে এত চমৎকার করে সৃষ্টি করেছেন যে, তাঁর চেহারা মোবারক দেখেই অনেকেই ঈমান এনেছিল। বুদ্ধিমান মাত্রই বলতেন কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা এরূপ হতে পারে না, নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর রসুল। তিনি ছিলেন গরিব-দুঃখী ও অসহায় মানুষের প্রতি আপনজন। কেউ অসুস্থ হয়ে আসলে সুস্থ হয়ে যেতেন। মূর্খরা জ্ঞানী, পাপীর ক্ষমা, আর বেঈমানরা দৌলত লাভ করতেন এবং অভাবী এলে ধনী হয়ে যেতেন। কর্কশ ও উগ্র মেজাজি হয়ে উঠত বিনয়ী, নম্র ও ভদ্র স্বভাবের মানুষ হিসেবে।

১১. শত্রুদের সঙ্গেও তিনি অমায়িক আচরণ করতেন

মাত্র একটি ঘটনা উল্লেখ করছি, আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল আজীবন আল্লাহর রসুল (স.) এর সাথে মারাত্মক দুশমনি করলেও তার মৃত্যুর পর ছেলে বিখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহর (রা.) অনুরোধে তাঁর গায়ের জামা দিয়ে কাফন পরিয়েছেন ও আল্লাহর রসুল (সা.) তাঁর জানাযায় ইমামতি করেছেন। মৃত শত্রুর সাথে এমন উদার ও হৃদয়বান আচরণে মুগ্ধ হয়ে তার (আব্দুল্লাহ বিন উবাই) বংশের এক হাজার লোক ইসলাম কবুল করেন। তায়েফ ও মক্কাবাসীদের প্রতি অসাধারণ উদারতা, দোয়া ও ক্ষমাশীলতা শত্রুদের প্রতি তাঁর অমায়িক ও রহমদিল আচরণ সহজেই অনুমেয়।

১২. সহজ পথ অবলম্বন করতেন

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, 'আল্লাহর রসুল (স.)-কে দু'টো কাজের মধ্যে যেকোনো একটি করার সুযোগ দিলে তিনি গুনাহ না হলে সহজটি বেছে নিতেন। তিনি নিজের জন্য কোনো অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতেন না, তবে আল্লাহর জন্য হলে প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়তেন না।' (বুখারি শরিফ)

ওয়াজ-নসিহত করতেন, যতক্ষণ না মানুষ বিব্রতবোধ করত, (বুখারি ও মুসলিম শরিফ) নফল নামাজ চুপে চুপে আদায় করতেন, যাতে অন্যের কষ্ট না হয়। তিনি বলতেন তোমরা এমন আমল কর, যা তোমাদের সাধ্যে কুলোয়। (বুখারি শরিফ)

১৩. বীরত্ব ও ধৈর্যশীলতা

যেকোন কঠিন বিপদ-মসিবতের মধ্যেও তিনি ছিলেন দৃঢ় পাহাড়ের মত অটল। মদিনায় হিজরতের প্রাক্কালে সাওর পর্বতের গুহায় অবস্থানকালে কাফেররা যখন গুহার অতি নিকটে চলে আসে; তখন আবু বকর (রা.) বিচলিত হয়ে উঠেন। তখন তিনি দৃঢ় ও অবিচলভাবে আবু বকরকে সান্ত্বনা দেন, 'ভয় পেয়ো না; আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।' মক্কি-জীবনে তেরটি বছর আতঙ্কময় অবস্থায় ও মাদানি জীবনে প্রতি মুহূর্তে জীবনের হুমকির মুখেও তিনি কোনদিন ভীত ও ধৈর্যহারা হয়ে যাননি। হযরত আলী (রা.) বলেন, 'কাফেরদের সাথে যুদ্ধ যখন ভয়াবহ কঠিন রূপ নিত, তখন আমার রসুল (স.) এর পেছনে গিয়ে আশ্রয় নিতাম। তিনি সর্বদা শত্রুর নিকটবর্তী থেকে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতেন । শত্রুর ভয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাবার মতো কোনো ঘটনা কখনো তাঁর জীবনে ঘটেনি, এমনকি ওহুদ যুদ্ধে চরম বির্পযয়ের পরও শত্রুদের ৮০ কি.মি. পর্যন্ত তাড়া করে নিয়ে গিয়ে সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন।

অভাব-অনটন, দুঃখ-বিপদ ও মুসিবতে সর্বাবস্থায় তিনি 'ছবরানজালিম' বা উত্তম সবর অবলম্বন করেছেন। শত্রুদের শত্রুতা যতই বৃদ্ধি পেত, তাঁর ধৈর্য ততই বেড়ে যেত। ওহুদ ও হুনাইনের যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব ও অসম সাহাসিকতা ছিল সীমাহীন।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, 'আমি একদিন আল্লাহর রসুল (স.) এর সাথে চলছিলাম, এসময় তাঁর গায়ে মোটা জরিদার একটি নাজরানি চাদর বেশ শোভা পাচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ এক বেদুঈন এসে তার চাদর ধরে এমন হেচকা টান দিল যে, তিনি বেদুঈনের বুকে পড়ে গেলেন, এতে আমি দেখলাম রসুল (স.) এর ঘাড়ে চাদরের দাগ পড়ে গেছে। অতঃপর (নরাধম) লোকটি বলল, 'হে মুহাম্মদ! আল্লাহর মাল যা তোমার কাছে আছে, তা থেকে আমাকে দেওয়ার নির্দেশ দাও।' তখন রসুল (স.) তার দিকে তাকিয়ে হেসে তাকে দান করার নির্দেশ দেন (এক উটে গম ও আরেক উটে খেজুর দেওয়া হয়েছে)। এরূপ অসংখ্য ঘটনায় আল্লাহর রসুল (স.) এর পরম ধৈর্য্য ও বদান্যতার পরিচয় মেলে। (বুখারি ও মুসলিম শরিফ)

১৪. ক্রোধ দমনশীল

মহানবি (স.) এর ক্রোধ ও দমনশৈলী ছিল অসাধারণ, অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এক পাহলোয়ান অনেক বড় বড় পাথর উত্তোলন করেছে; আর জনগণ তাকে বীর বলে বাহবা দিচ্ছে। আল্লাহর রসুল (স.) বলেন, 'প্রকৃত বীর ঐ ব্যাক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে।' (বুখারি শরিফ)

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, 'তিনি কখনো নিজ স্বার্থে, নিজ হাতে কাউকে মারেননি, এমনকি কোনো মহিলা, স্ত্রী বা খাদেমকেও না।' (মুসলিম শরিফ)

১৫. তাঁর হাসি ও রসিকতা

তিনি সর্বদা মুচকি হাসি দিতেন। কখনো অট্টহাসি দিতেন না। সদাপ্রফুল্ল ও প্রাণবন্ত থাকতেন। কখনো গোমরাহ মুখে থাকতেন না। তবে দুশ্চিন্তায় পড়লে তাঁর চেহারায় এর ছাপ পড়ত। তখন তিনি নামাজরত হতেন (আবু দাউদ)। তিনি হালকা রসিকতা করতেন। একদিন এক বৃদ্ধা এসে বলল, হে রসুল! আমার জন্য দোয়া করুন, যেন আল্লাহ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। তিনি বললেন, হে অমুকের মা! কোনো বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এ কথা শুনে মহিলা কাঁদতে আরম্ভ করল। আয়েশা (রা.) জিজ্ঞাসা করেন, তার কী দোষ? জবাবে আল্লাহর রসুল (স.) বলেন, 'জান্নাতবাসী নারী-পুরুষ সবাই ৩০ থেকে ৩৩ বছর বয়সি হবে। (তিরমিযী শরিফ) রসুল (স.) মহিলাকে বলেন, তোমাকে আল্লাহ যখন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তখন সুন্দরী যুবতী করেই প্রবেশ করাবেন। এ কথা শুনে বৃদ্ধা হেসে উঠেন।

১৬. বাকরীতি

আল্লাহর রসুল (স.) হাসিমুখে বিশুদ্ধ, মার্জিত ও অত্যন্ত চমৎকারভাবে কথা বলতেন। এটা দ্রুত শ্রোতার মন জয় করত; আর এটাকেই লোকেরা জাদু বলত। তাঁর এরূপ উন্নত, চিত্তাকর্ষক, মর্মস্পর্শী, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ ভাষা শুনে মুগ্ধ হয়েই ইয়েমেনের যেমাদ আসদিসহ বহু জাতীয় নেতৃবৃন্দ ইসলাম গ্রহণ করেন। যদিও লিখতে পড়তে পারতেন না, তথাপি তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ। তাঁর ভাষা এত সমৃদ্ধশালী হবার কারণে জাল হাদিস সহজে চিহ্নিত করা যায় এবং আরবি সাহিত্যে সর্বোচ্চ মর্যাদা পেয়েছে। তিনি কোনোদিন কোনো অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতেন না। তাঁর বক্তব্য হলো হয় ভালো কথা বলো- না হয় চুপ থাকো। তিনি এ স্বভাবের অধিকারী ছিলেন।

১৭. সংসার-জীবন

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রসুল (স.) স্ত্রীদের ঘরের যাবতীয় কাজে সহায়তা করতেন। বাহির থেকে খাবারের সময় এসে যদি দেখতেন রান্না-বান্না হয়নি এতে তিনি কখনো মন খারাপ করতেন না বরং হাসিমুখে স্ত্রীদের রান্নার কাজে সাহায্য করতেন। তিনি ঘর ঝাড়ু দিতেন। তিনি নিজের জামা-জুতা সেলাই করতেন, নিজ হাতে জামা-কাপড় পরিষ্কার করতেন ও বকরি দোহন করাসহ নিজের যাবতীয় কাজ-কর্ম নিজেই করতেন। (মিশকাত শরিফ)

১৮. সামাজিক-জীবন

হযরত মুহাম্মাদ (স.) ছিলেন সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মানুষ। তিনি ছিলেন সমাজ-সচেতন। সমাজের সমস্যা সমাধানে, সমাজ উন্নয়নে, সমাজ থেকে অসামাজিক কার্যক্রম দূরীকরণে তিনিই ছিলেন সবার আগে, পাড়া-প্রতিবেশী এবং নিজ ও স্ত্রী সম্পর্কে, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সুসর্ম্পক বজায় রাখতেন। কারো ক্ষতি হতে পারে এমন কাজ কখনো করেননি। পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে দূরে থাকতেন। সঙ্গী-সাথীদের খোঁজ খবর নিতেন। তিনি শত্রুদের দেয়া কষ্ট ও মূর্খদের বাড়াবাড়িতে ধৈর্যধারণ করতেন। তিনি মন্দকে মন্দ ও ভালোকে ভালো বলতেন। তিনি সর্বদাই মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতেন। (বুখারি শরিফ) তিনি সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁর নিকট লোকদের মর্যাদার ভিত্তি ছিল তাকওয়া। সমাজের দুর্বল শ্রেণির প্রতি তাঁর করুণা ছিল সর্বাধিক। তিনি বলতেন, তোমরা আমাকে দুর্বল শ্রেণির মধ্যে তালাশ কর। কেননা, তোমরা রুজি ও সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকো দুর্বল শ্রেণির মধ্যেমেই। (আবু দাউদ) অর্থাৎ তাদের সাথে সদাচরণের মাধ্যমে আমার সন্তুষ্টি তালাশ কর। তিনি সর্বস্তরের লোকদের সাথে অত্যন্ত নম্র আচরণ করতেন। তাঁর সীমাহীন ধৈর্য, অতুলনীয় চরিত্র মাধুর্য, অমায়িক ব্যবহারের প্রভাবেই রুক্ষ স্বভাবের বর্বর মরুচারী আরব দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছিল।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি দীর্ঘ ১০ বছর রসুল (সা.) এর খেদমত করেছি। এসময়ে তিনি কোনোদিন আমার নিকট থেকে কোনো কৈফিয়ত তলব করেননি। কোনো কাজ আমার করা কর্তব্য ছিল, আমি যদি তা না করতাম, তবুও তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করতেন না যে, কেন তুমি এ কাজটি করনি? আবার যে কাজ করা আমার উচিত ছিল না, আমি সে কাজ করলে ও অন্যায় করলেও বকা-ঝকা কিংবা মারধর তো দূরের কথা তিনি আমাকে কোনোদিন ধমকও দেননি।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর আদর্শ আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করার তাওফিক দান করুন। আল্লাহুম্মা আমীন।

লেখক: ইসলামি চিন্তাবিদ ও গবেষক

দশভুজা দেবী দুর্গা

ড. কালিদাস ভক্ত

জগৎ মাঝে যখন খুব খারাপ অবস্থা বিরাজ করে, অশুভ শক্তির কাছে শুভ শক্তি পরাস্ত, সমাজে বিরাজ করে চরম বিশৃঙ্খলা, তখন দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের জন্য সমস্ত অশান্তি অরাজকতা বিদূরীভূত করতে, শান্তির আবাস নির্মাণ করার জন্য দেবী মহামায়া আবির্ভূত হয়েছেন। শ্রীশ্রী চণ্ডীতে উক্ত রয়েছে– মহিষাসুর চরম সাধনায় ব্রহ্মাকে তৃপ্ত করে তাঁর কাছ থেকে বর লাভ করেছিলেন, কোনো পুরুষ তাকে বধ করতে পারবে না। ব্রহ্মার এই বরে বলীয়ান হয়ে মহিষাসুর দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গরাজ্য দখল করে। দেবতারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হন। স্বর্গরাজ ইন্দ্র সকল দেবতাদের একত্রিত করে ব্রহ্মা ও শিবের কাছে যান। তখন ব্রহ্মার পরামর্শে সবাই মিলে বিষ্ণুর কাছে যান। মহিষাসুরের অত্যাচারের কাহিনি শুনে সবাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তাঁদের শরীর থেকে তেজ বেরুতে থাকে। সকল দেবতাদের তেজ একত্রিত হয়ে এক তেজোপুঞ্জের সৃষ্টি হয়। সেই তেজোপুঞ্জ এক নারীর রূপ নেয়। এই নারীই দেবী দুর্গা। তাঁর দশ হাত রয়েছে বলেই তাঁকে দশভুজা বলা হয়। তাঁর তিনটি চোখ, এজন্য তাঁকে ত্রিনয়নী বলা হয়। তাঁর বাম চোখ চন্দ্র, ডান চোখ সূর্য এবং কপালের উপর অবস্থিত চোখকে জ্ঞান চোখ বলা হয়। তাঁর হাতে দশটি অস্ত্র রয়েছে যা শক্তির প্রতীক। সবচেয়ে শক্তিধর প্রাণি সিংহ তাঁর বাহন। দেবী হিসেবে দুর্গার গায়ের রং অতসী ফুলের মতো সোনালি-হলুদ। তিনি তাঁর দশ হাত দিয়ে দশ দিক থেকে অকল্যাণ দূর করেন এবং আমাদের মঙ্গল করেন। দেবী দুর্গার ডানদিকের পাঁচ হাতের অস্ত্রগুলো যথাক্রমে ত্রিশূল, খড়গ, চক্র, বাণ ও শক্তি নামক অস্ত্র। বামদিকের পাঁচ হাতের অস্ত্রগুলো যথাক্রমে শঙ্খ, ঢাল, ঘণ্টা, অঙ্কুশ ও পাশ। এ সকল অস্ত্র দেবী দুর্গার অসীম শক্তি ও গুণের প্রতীক। আবার জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে দশ হাত হলো দশদিকের প্রতিভূ। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈঋত, ঊর্ধ, অধঃ– এই দশদিক থেকে মহিষাসুরকে বধ করার জন্য দেবী

দুর্গার দশটি হাত সৃষ্টি হয়। এই দশদিককে দশপ্রহরণী বলা হয়। দশপ্রহরণ নিয়ে মহিষাসুরকে আক্রমণ করেছেন। তবে লোকমুখে প্রচলিত মানবজাতির অশুভশক্তি বিনাশের জন্য দেবীকে দশ প্রহরণধারিণী বলা হয়। মূলত ভক্তগণ শক্তি পাবার মানসে সেই সাথে জাগতিক ও পারমার্থিক কল্যাণলাভের জন্য দেবী দুর্গার আরাধনায় রত হয়ে থাকেন। দেবীর আরাধনা ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে। তবে বঙ্গদেশে এর প্রসার ও প্রচার সর্বাধিকভাবে পরিলক্ষিত হয়। গবেষকদের মতে সম্রাট আকবরের সময়ে ষোড়শ শতকের শেষের দিকে বর্তমান রূপের শারদীয় দুর্গাপূজা প্রচলিত হয়। বাংলায় দুর্গা পূজা সূচিত হয় উত্তরবঙ্গের রাজশাহী অঞ্চলের রাজা কংসনারায়ণের সময়ে। এ পূজা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী রাজাকে বলেছেন– 'কলির যুগে মহাযজ্ঞ হচ্ছে দুর্গোৎসব। এ অনুষ্ঠানে সকল যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তাই আপনি দুর্গা পূজা করুন।' সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ বেদ থেকে শুরু করে বিখ্যাত গ্রন্থে দেবী দুর্গার উল্লেখ আছে। রামায়ণে রামচন্দ্র ১০৮টি নীলপদ্ম দিয়ে দুর্গা দেবীর পূজার আয়োজন করেছিলেন এবং মহাভারতের ভীষ্ম পর্বে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধারম্ভের পূর্বে জয়ের জন্য দুর্গাপূজার উপদেশ দিয়েছিলেন। সর্বপ্রথমে বসন্তকালে বাসন্তী দুর্গাপূজা হতো। রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য বসন্তকালে দুর্গাপূজা করেছিলেন। তাঁদের পূজা করার পেছনের কাহিনি হলো– রাজা সুরথ রাজ্য হারিয়ে বনে বনে ঘুরছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি এলেন মেধা নামে এক মহর্ষির আশ্রমে। অন্যদিকে সমাধি নামে এক বৈশ্য স্ত্রী ও সন্তানদের আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। তিনিও ঘুরতে ঘুরতে আসেন মেধা মুনির আশ্রমে। আশ্রমে এসেও হারানো রাজ্যের জন্য রাজা সুরথের মনে মায়া কাজ করেছিল। আবার সমাধি বৈশ্যও তার স্ত্রী-পুত্রদের ভুলতে পারছিলেন না। কেন এই অন্তরের আকর্ষণ! রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের দেখা হলো। দু'জন দু'জনের কাছে মনের কথা ব্যক্ত করলেন। তারপর গেলেন মহর্ষি মেধার কাছে। গিয়ে জানালেন নিজেদের অন্তরের কথা। মহর্ষি মেধা বললেন যে, এর নাম মায়া। আর এ মায়া হচ্ছে মহামায়ার প্রভাব। তবে মহামায়া সন্তুষ্ট হলে তিনি কৃপা করেন এবং মুক্তি দান করেন। মহর্ষি মেধা মহামায়ার মাহাত্ম্য রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের কাছে বর্ণনা করলে দেবীর কৃপায় তাদের জাগতিক ও মানসিক অশান্তি দূরীভূত হয়। মহামায়া দুর্গারূপে দুর্ধর্ষ অসুররাজ মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। অসুরদের অত্যাচার হতে দেবগণ মুক্ত হলেন, ফিরে পেলেন তাঁদের প্রিয় স্বর্গরাজ্য। অপরদিকে দেবী দুর্গার আবাহনের মধ্য দিয়ে ধরামাঝে নারীর শক্তি প্রকাশ পায়। বিভিন্ন মনীষীরা দুর্গারূপেই নারীকে কল্পনার কথা বলেছেন। তাঁর পূজার মাধ্যমে নারীর ভূমিকাকে আরও বড় করে দেখানো হয়েছে। দেবী দুর্গাকে জগজ্জননীরূপে বন্দনা করার মাধ্যমে নারীকেও মাতৃরূপে রূপায়িত করা হয়েছে। দুর্গা মহিষাসুর বধকারী হিসেবে মহাশক্তি দিয়ে অপশক্তি অপসারিত করেছেন। এমনিভাবে দেবী দুর্গা সৃষ্টির প্রতীক, সমৃদ্ধির প্রতীক, সুরক্ষার প্রতীক। নারীও মাতৃরূপে সৃষ্টির প্রতীক, সন্তান জন্ম দিয়ে সন্তানের মুখে আহার তুলে দিয়ে, সন্তানকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন। মহামহিমাময় নারী জগৎ-সংসারে ভালোবাসা দিয়ে, প্রেরণা দিয়ে, শক্তি দিয়ে বিজয়ী করার জন্য দশহাত দিয়ে কাজ করছেন এবং পরিত্রাণ করছেন। এই মাতৃসম নারী যেন বঞ্চনার শিকার না হন। সেইসাথে খারাপ প্রবৃত্তির আক্রোশে শিকার হয়ে নারীরা যেন কলঙ্কিত না হন। সবাই মিলে মহৎতম গুণ দিয়ে ধরাকে আনন্দধাম করতে হবে। দেবী দুর্গার অবাহন হোক অশুভ শুক্তির বিরুদ্ধে শুভশক্তির প্রকাশ। বৈশ্বিক দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণের পন্থাধারী। শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিপালনের মমতারূপী। অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের প্রকাশ। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িকতার মেলবন্ধন। আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে উদার ধারণার উন্মেষ। অসুরশক্তির বিরুদ্ধে সুরশক্তির জয়গান। দুঃখ-কষ্ট থেকে আনন্দের প্রকাশ। যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে শান্তির বার্তা সূচিত হোক। সর্বশেষে মায়ের কাছে ভক্তকান্ত গীতিকবির প্রার্থনায় বলতে হয়– 'জাগো তুমি জাগো... জাগো দুর্গা! জাগো দশপ্রহরণধারিণী! অভয়াশক্তি বলপ্রদায়িণী তুমি জাগো!'

বাংলায় দুর্গা পূজা সূচিত হয় উত্তরবঙ্গের রাজশাহী অঞ্চলের রাজা কংসনারায়ণের সময়ে। এ পূজা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী রাজাকে বলেছেন– 'কলির যুগে মহাযজ্ঞ হচ্ছে দুর্গোৎসব। এ অনুষ্ঠানে সকল যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তাই আপনি দুর্গা পূজা করুন।' সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ বেদ থেকে শুরু করে বিখ্যাত গ্রন্থে দেবী দুর্গার উল্লেখ আছে

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শান্তির প্রচ্ছায়

আবু জাফর আবদুল্লাহ

যুলমৎ কেটে গেছে। পূর্ব দিগন্তে দেখছি এখন
ঝলমলে সূর্যের নবীন আভা।
এতেই এখন আমাদের অর্থাৎ বাংলাদেশিদের
নাইতে হবে সব বেদনা আর দুঃখ ভুলে।

জীবনতো নয় কেবল সুবাসিত গোলাপের গন্ধভরা
সুসময়। দুঃখ-কষ্ট থাকবেই- এটাই সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য।
নতুন উদ্যমে এখন আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে
যাবার পালা বৈষম্যহীন চেতনার অনন্ত বৈভবে
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নতুন প্রজ্ঞায়।
আর কোনো কথা নয়। কোনো দ্বিধা নয়। চলো সবাই
চলো সম্মুখ পানে বাধাহীন, বেদনাহীন শান্তির প্রচ্ছায়।

সুর-মূর্ছনা

সুমন সরদার

নদীর প্রবাহে কোনো জল নয়, রক্তের স্রোত
কোনো পাহাড়ের বুক চিরে ঝরা নহর প্রবাহ
ব্যথার অথৈ যাত্রাসময়, সাপের শরীর যেন
-অনুবাদে দেখা পাখিডাকা ভোরে।
এইসব দেখে ক্লান্ত হয়নি-
মনের ভেতর বহমান যার
ছলাৎ ছলাৎ নীলবেদনার সুর-মূর্ছনা।
অর্ঘ্যডালায় থরে থরে আছে শব্দের মালা
লতাগৃহবুকে কোন্ কৌশলে ভালো বেসে বেসে
বেঁধেছিল বাসা সাদা রং পাখি
সে সাদা পাখির পালক ঝরছে, ঝরছে কণ্ঠসুধা
আজও জীবন্ত অনন্ত পাখি-শিসে মিশে থাকা গান
ঝরছে ঝরছে... ঝরবে ঝরবে...

এই ব্যথা বুকে নজরুল আজও বাসা বেঁধে দেয় চুম
পাখিও করুণ সুরে মেতে মেতে ভুলে গেছে আজ ঘুম।

নগর জীবনে প্রকৃতির সান্নিধ্য

প্রফেসর আবু নোমান ফারুক আহম্মেদ

বাইরে থেকে মিষ্টিসুরে আওয়াজ এলো, বাবু ডেকেছিস কেনে?/ বেরিয়ে এসে দেখি, ক্যামেলিয়া/সাঁওতাল মেয়ের কানে,/কালো গালের উপর আলো করেছে।/সে আবার জিগেস করলে, 'ডেকেছিস কেনে'?/আমি বল্‌লেম 'এই জন্যেই'/তারপর ফিরে এলেম কলকাতায়.....বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত 'ক্যামেলিয়া' কবিতার লাইন এটি। ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কবি শেষবারের মতো ঢাকায় আসেন। রাতে অবস্থান করেন বলধা গার্ডেন এর জয় হাউজে। আর এখানেই ক্যামেলিয়া কবিকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কলকাতা ফিরে গিয়ে লিখলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'ক্যামেলিয়া' যা পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের অর্ন্তগত, যা নিয়ে পরবর্তীতে চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছিল।

কবির মতো আপনার মনকেও প্রশান্তিতে ভরে দিতে পারে প্রকৃতির সান্নিধ্য। সবাই বলে সুস্থ থাকতে হলে প্রয়োজন প্রকৃতির কাছে থাকা। প্রাচীনকালে যেমন ডাক্তাররা অসুস্থ ব্যক্তিকে বলতেন বায়ু পরিবর্তন আবশ্যক। কিন্তু নগরজীবনে কোথায় পাব প্রকৃতি। দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততায় যেখানে দু'দণ্ড দম ফেলার জোগাড় নেই সেখানে কীভাবে হবে বায়ু পরিবর্তন। না সবই সম্ভব। নগরজীবনেও আপনি অনায়াসে থাকতে পারেন প্রকৃতির কাছাকাছি। বাড়ির ছাদে গড়ে তুলতে পারেন একটি চমৎকার বাগান। মৌসুমি ফুল, শাকসবজি, ফলমূল অনায়াসে চাষ করতে পারেন সেখানে। ছোট একটা চৌবাচ্চায় করতে পারেন মাছ চাষও। ছাদে খরগোশ, কবুতর কিংবা কোয়েল পালনও কিন্তু মন্দ নয়। অনেকে আবার মাশরুমও চাষ করেন। ঘরের ইন্টেরিওর সাজিয়ে নিতে পারেন প্রকৃতি দিয়ে। কয়েকটি নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যের পেইন্টিং বা ফটোগ্রাফ আপনার মনকেও সবুজ করে তুলবে। ব্যালকনিতে অর্কিড, ক্যাকটাস এবং একই সাথে শখের ময়না, টিয়াও পুষতে পারেন। ঘরে একটি একুরিয়ামে বাহারি মাছ সহজেই মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করে। বাড়ির সামনে জায়গা থাকলে সেখানে সবুজ লন তৈরি করতে পারেন। বিকেলের অবসরে সবুজ লনে বসে অনায়াসে এক কাপ কফি উপভোগ করতে পারেন অথবা ছুটির দিনে জমিয়ে তুলতে পারেন পারিবারিক আড্ডা।

বাসার আঙিনায় ফুল ফল শাক সব্জির বাগান করা আমাদের একটি সাধারণ শখ। এই তো সেদিনও প্রতিটি বাসার আঙিনায়ই কিছু না কিছু ফুল, ফল আর সব্জির বাগান দেখা যেত। সকাল-বিকাল, অবসর সময়ে পরিবারের সবাই মিলে বাগানে কাজ করার আনন্দই ছিল অন্যরকম। টব থেকে কাঁচামরিচ-টমেটো তুলে সালাদ বানাতে কার না ভালো লাগে। নিজের বাগানের উৎপাদিত ফুল, ফল, শাক-সব্জি প্রতিবেশীদের মাঝে ভাগাভাগি করে উপভোগ করার রেওয়াজ ছিল কিছুদিন আগেও।

জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপে আবাসন সমস্যার সমাধানে ঢাকা-সহ পাশ্ববর্তী অন্যান্য শহরেও অত্যাধুনিক এপার্টমেন্টের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। শখ করে বাসার আঙিনায় বাগান করার মতো জায়গা এখন ঢাকা শহরে নাই বললেই চলে। কিন্তু তাই বলে মানুষ বাগান করবে না, তা কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না।

এপার্টমেন্টের ছাদে, ব্যালকনি বা ঘরের ভিতর স্থানভেদে বিভিন্ন ফুল, ফল-সব্জির চাষ করা যেতে পারে। তবে ছাদে সব ধরনের গাছ উপযোগী হলেও ঘরে বা ব্যালকনির ক্ষেত্রে গাছ নির্বাচনে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। ছায়ায় ভালো জন্মে এমন গাছ ঘরের ভিতরের জন্য নির্বাচন করা উচিত। ঘরে বা ব্যালকনিতে সাধারণত বহুবর্ষজীবী বাহারি পাতা বা ফুল জাতীয় গাছ নির্বাচন করা উচিত। রাবার বা বট জাতীয় গাছ, ফিলোডেনড্রন, হেডেরা, অরোকেরিয়া, ফার্ন, পাতাবাহার, ড্রাসেনা, কলিয়াস ইত্যাদি লাগানো যেতে পারে। বারান্দায় রাখা যায় এমন গাছের মধ্যে ক্রোটন, বাহারি কচু, পাম, ম্যারেন্টা, ড্রাসেনা, কোলিয়াস, ডাইফেনবেকিয়া, বেলি, জুঁই, হাস্নাহেনা, নয়নতারা, জাপানিজ টগর, মুসাণ্ডা অন্যতম। লতানো গাছ মর্নিং গ্লোরি, অপরাজিতা, মাধবিলতা, বাগানবিলাস, কোরাল ভাইন, ঝুমকোলতা, মানিপ্লান্ট সহজেই সকলের নজর কাড়ে।

এছাড়া বারান্দায় এরিডিস, রিনকোস্টাইল, কেটেলিয়া বা ডেনড্রোরিয়াম জাতীয় অর্কিড ঝুলিয়ে দিলে বেশ সুন্দর দেখায়। তাছাড়া বারান্দায় গ্রিলে ফার্ন বা পর্টুলেকা ঝুলিয়ে দেয়া যেতে পারে। তবে মৌসুমি ফুল এ্যাস্টার, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গ্ল্যাডিওলাস, জারবেরা, গোলাপ বারান্দায় রাখা যেতে পারে। ঘরে অ্যানথুরিয়াম, ডাইফেনবেকিয়া, ম্যারান্টা, মনস্টেরা ইত্যাদি বাহারি পাতার গাছ টবে লাগিয়ে রাখা যেতে পারে। এপার্টমেন্টের যেসব ঘরে এসি চলে সেসব ঘরে ঠাণ্ডাপ্রিয় গাছ বাছাই করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে ইংলিশ আইভি, ম্যারেন্টা, জ্যাকোবিনিয়া, রাবার, বট ও মানিপ্লান্ট রাখা যেতে পারে। দু-একটি বনসাই ড্রইং রুমে আভিজাত্য আনে।

বাগানে বড় বড় টব বা বিভিন্ন আকার-আকৃতির কন্টেইনার বা ড্রাম ব্যবহার করা যেতে পারে। ছোট ঘরে অপেক্ষাকৃত ছোট মাঝারি সাইজের কনটেইনার ভালো দেখায়। প্রয়োজনে কনটেইনার ঘরের পর্দার রং এর সাথে মানানসই রং করে নেয়া যেতে পারে। তবে বর্তমানে ঢাকা শহরের বিভিন্ন নার্সারিতে, দোয়েল চত্বরে, ধানমন্ডির রাস্তার পাশে অনেক সুন্দর সুন্দর টব পাওয়া যায়। ব্যালকনিতে সুদৃশ্য ঝুলন্ত বাস্কেটেও গাছ লাগাতে পারেন যা বাসার পরিবেশকে ভিন্ন আমেজ দেয়। ঝুলন্ত টবে ফুলের গাছ, ফার্ন, ক্যাকটাস বা বাহারি পাতার গাছ রাখা যেতে পারে। ঝুলন্ত টবের কিনারায় ক্রিপার বা লতানো গাছ দিলে পাতা নীচে ঝুলে থাকে। আবার দেয়ালের গায়ে বা গ্রিলে মানিপ্লান্টের গাছ লাগালেও সুন্দর দেখা যায়। বারান্দা বা গ্রিলে ঝোলানোর জন্য টবে ন্যাস্টারশিয়াম ষ্টার, ভারবেনা উত্তম। গ্রিলে লতিয়ে দেয়ার জন্য নীলমনি, সুইটপি, মর্নিং গ্লোরি ভালো। গাছ দিয়ে ঘরে বা ছাদে পার্টিশান দেয়ার জন্য ক্রোটন, রক্তপাতা, রিবন প্লান্ট, ডাম্বকেইন, শতমূলী, ক্যালাডিয়াম, ড্রাসেনা ও এ্যাগলিওনিমা গাছ নির্বাচন করা যেতে পারে।

গাছের বৃদ্ধির জন্য সূর্যালোক প্রয়োজন তাই মাঝেমধ্যে ঘরের টবগুলো সূর্যালোকে রাখতে হবে। প্রয়োজনমত গাছের খাবার দিতে হবে। তবে রাসায়নিক সার না দিয়ে জৈব সার দিলে গাছ বেশিদিন সতেজ থাকে। গাছে পানি প্রয়োগের সময় খুব সচেতন হতে হবে। কম করে প্রতিদিন পানি প্রয়োগ ভালো। বাহারি গাছের ডাল-পালা কিছুদিন পর পর ছেটে করে দিতে হয়। টবের মাটি দুইমাস পরপর নিড়ানি দিয়ে ভালোভাবে ওলট-পালট করে কিছু গোবর সার মিশিয়ে দিতে হবে। এছাড়া গাছের পাতা সপ্তাহ খানেক পর পর এক বালতি পানিতে ৭-১০ ফোটা নারিকেল তেল বা অলিভ অয়েল মিশিয়ে হালকাভাবে মুছে দিলে পাতা উজ্জ্বল দেখাবে। বিশেষ উৎসবে গাছের পাশে ল্যাম্প বা গাছের উপর মরিচবাতি দিয়ে সাজালে ঘরে নতুনত্ব আসবে।

ছাদে একটি বাগান বানিয়ে সেখানে নিঃশ্বাস নিন প্রাণভরে। পরিবেশ ও স্বাস্থ্য- দু'টোই থাকবে ভালো। কীটপতঙ্গ, পাখি ও প্রজাপতি সঙ্গ দেবে। ঠিক আগে যেমন দিত। শহরে সবুজ ক্রমেই বিরল হয়ে পড়েছে। সবুজ এবং ছায়ার সম্মিলন থাকলে, সেখানে মানুষজনের খানিকটা স্বস্তি মেলে। কংক্রিটের জঙ্গলে যেমন বসবাস করা যায় না, ঠিক তেমনি বনে-জঙ্গলে অথবা গুহায় বাস করাও অসম্ভব। কিন্তু দুটির সমন্বয় করলেই আমরা নগরেও স্বাস্থ্যকর আবাসন গড়ে তুলতে পারি।

এখন শহরের বাড়িগুলোর সামনে বাগান করার চল শুরু হয়েছে। অ্যাপার্টমেন্টের সামনের অংশটুকু ফাঁকা রাখা বা সীমানাপ্রাচীর ঘিরে ভবন তোলার দিন শেষ। রীতিমতো ঘোষণা দিয়ে বলে দেওয়া হচ্ছে, বাড়ির কতটা অংশজুড়ে থাকবে শখের বাগান। রাজউকের নতুন নিয়মে বেশ কিছু জায়গা বাগান হিসেবে ব্যবহারের জন্য বলা হয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাড়ির ছাদে বাগান করা বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আমাদের দেশেও অনেকে বাড়ির ছাদে বাগান করছেন। অনেকের বাগান করার শখ দীর্ঘদিনের। কিন্তু এক খণ্ড জায়গার অভাবে তা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তারাও বাড়ির ছাদে বাগান করতে পারেন। বাগানের চাষ করা সবজি দিয়ে বাড়ির সবজির চাহিদাও পূরণ করা সম্ভব। পরিকল্পিতভাবে উদ্যোগ নেয়া হলে বাড়ির ছাদে যেকোনো গাছ, শাকসবজি ফলানো সম্ভব। আঙুর, বেদানা, ডালিম, আমড়া, পেয়ারা প্রভৃতি ফল ছাড়াও কলমিশাক, কলা, ডাঁটা, লাউ অনায়াসে উৎপাদন করা যায়। ছাদে বাগান দু'ভাগে করা যায়। যেমন কাঠ বা লোহার ফ্রেমে এঁটে বেড তৈরি করে এবং অন্যটি হলো টব, ড্রাম, পট, কনটেইনার এসব ব্যবহার করে। বেডে অন্তত দু'ফুট পুরু মাটির স্তর থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, শাক-সবজি, ফুলের জন্য ছোটখাট টব বা পাত্র হলেও চলে। কিন্তু ফলের ক্ষেত্রে পাত্র/ড্রাম যত বড় হয় তত ভালো। টবে/ড্রামে গাছে/ জাত নির্বাচনের পর নিয়মমতো সাজাতে হবে। যেমন বড় গাছ পূর্ব ও দক্ষিণ পাশে না দিয়ে পশ্চিম ও উত্তর পাশে দিতে হবে। এতে আলো বাতাস রোদ ভালোভাবে পাবে। তাছাড়া ছোট বড় জাতের মিশ্রণ করে সেটিং করলে গাছের বৃদ্ধি ভালো হয়। আরেকটি জরুরি কথা হলো ছাদে বাগান করার ক্ষেত্রে ফল চাষাবাদে কলমের এবং হাইব্রিড জাতের চারা ব্যবহার করতে হবে।

একসময় আমাদের এই শহরে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ছোট ছোট পশুপাখি ও কীটপতঙ্গের অবাধ বিচরণ ছিল। প্রজাপতির ওড়াওড়ি, পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ, জোনাকির জ্বলা-নেভা আজ শহর থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। কবে কে দেখেছে শহরের কোনো এলাকায় রাতের নিস্তব্ধতায় জোনাকির আলো, শুনেছে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। একটু চেষ্টা করলেই আমরা এই হারানো সৌন্দর্য ফিরে পেতে পারি

একসময় আমাদের এই শহরে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ছোট ছোট পশুপাখি ও কীটপতঙ্গের অবাধ বিচরণ ছিল। প্রজাপতির ওড়াওড়ি, পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ, জোনাকির জ্বলা-নেভা আজ শহর থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। কবে কে দেখেছে শহরের কোনো এলাকায় রাতের নিস্তব্ধতায় জোনাকির আলো, শুনেছে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। একটু চেষ্টা করলেই আমরা এই হারানো সৌন্দর্য ফিরে পেতে পারি। অনেক গাছ আছে, যার ডালে শুধু বিশেষ ধরনের পাখি বসে এবং বাসা বানায়। আবার ফুল ও ফলের রকমভেদ আছে, যার জন্য প্রজাপতিদেরও সমাহার হয়। প্রকৃতির এ ভারসাম্য টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদেরই। শহর অঞ্চলের সবুজ ছাদ হতে পারে ছোট একটি বাগান, যা প্রতিদিনের কোলাহল থেকে নিজেকে কিছুটা সময়ের জন্য সরিয়ে রাখতে পারে। হোক না ছোট পরিসর, তারপরও স্বস্তি আর আনন্দের উৎস তো! অফিস কিংবা বসতবাড়ি সর্বত্রই প্রকৃতির উপস্থিতি আপনার মনকে প্রফুল্ল রাখবে, শরীর সুস্থ রাখবে আর কাজে আনবে গতি। কারণ প্রকৃতি মানেই প্রশান্তি, আর তাই থাকুন প্রকৃতির কাছাকাছি।

লেখক: অধ্যাপক, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মশা

মুস্তাফা মাসুদ

– স্ট্রেঞ্জ! কী বলছেন আপনি!

– হ্যাঁ, সত্যি বলছি- হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্যি বলছি, একচুলও মিথ্যে বলছি না ডাক্তার সাহেব! রীতিমতো আর্তনাদ করে ওঠেন কাসেম গোলদার।

– মশাটা কিংবা মশাগুলোকে একবারের জন্যও দেখতে পাননি?

– না! রাতে একশো পাওয়ারের বাতির আলোয় দেখতে পাই না, দিনের আলোতেও না। সন্ধ্যে হতেই মশার ওষুধ ছিটাচ্ছি, কয়েলও জ্বালানো হচ্ছে। তবুও সে বা তারা আমাকে রোজ কামড়াচ্ছে, রক্ত চুষে নিচ্ছে। মুখ, হাত, পিঠ মশার কামড়ে দাগড়া-দাগড়া করে দিচ্ছে। দিনরাত খাটের ওপর মশারি টানানোই থাকে- কি শীত, কি বসন্ত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত, কোনো বিরাম নেই; খাটজোড়া নীল

রংয়ের এক বিশাল মশারি চারপাশ টান-টান করে দাঁড়িয়ে থাকে চব্বিশ ঘণ্টা।

– আচ্ছা, মশাটা বা মশারা কি আপনার স্ত্রীকেও কামড়ায়? এক-খাটেই তো শোন আপনারা, নাকি?

– আগে একসাথে এক-বিছানাতেই শুতাম। তখন মশা বা মশারা তাকে কখনো কামড়ায়নি- শুধু আমার দফারফা করেছে। তার কানের কাছে বা কপালের পাশে একটু ভুনভুনও করেনি। কিন্তু আমার দাপাদাপি আর অস্থির ছটফটানির কারণে সারারাত সে একটুও ঘুমোতে পারত না; যার জন্য সে অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকে। তখন আমিই জোর করে তাকে অন্য ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা করি। এখন একা-ঘরে বিশাল খাটে বিরাট এক মশারির নিচে আমি একা থাকি। আর এতে যেন মশার বা মশাদের ভারি সুবিধে হয়েছে। সে বা তারা এখন স্বাধীনভাবে তাদের অপারেশন চালাতে পারছে। আগে হয়ত বউকে দেখে একটু হেজিটেট করত! এখন একটু চোখ বুজেছি কী বুজিনি, অমনি পিনফোটা যন্ত্রণা। তন্দ্রার মধ্যেই ধড়াম করে থাপ্পড় মারি অনুমানে। কিন্তু আমার থাবার নিচে কিছুই পড়ে না- না মশা বা মশারা; না চুষে-নেওয়া আমার রক্ত। শুধু থাপ্পড়ের জায়গাটা ভীষণভাবে ফুলে ওঠে। আহ! ডাক্তার সাহেব! আমাকে এই বিপদ থেকে বাঁচান!

ডাক্তার হারুনুর রশিদ বিলেত থেকে উচ্চ ডিগ্রিপ্রাপ্ত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। তার এতদিনের ডাক্তারি জীবনে এমন অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আর হয়নি। আরে বাবা, মশার কামড় থেকে বাঁচতে কেউ ডাক্তারের কাছে আসে নাকি? ও-কাজ ডাক্তারেরা করলে মশারি আর কয়েল-বিক্রেতাদের ব্যবসা মাটি হয়ে যাবে না! তাছাড়া ডাক্তারি বিদ্যেয় তো মশা তাড়ানোর থিওরি পড়ানো হয় না; মশাঘটিত রোগের চিকিৎসার দাওয়াই বাতলানো হয়- এসব নিতান্ত হালকা-ছেলেমানুষি চিন্তার এলোমেলো হাওয়ায় খানিকক্ষণ ঘুরপাক খেয়ে ডাক্তার হারুন নিজের পজিশনে ফিরে আসেন। তিনি যে বিলেতফেরত ডাকসাঁইটে সাইকিয়াট্রিস্ট, সেটা মনে হতেই তিনি সব হালকা চিন্তা আর চপল-লঘু ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসেন। আর তখনি হঠাৎ গোলদারের সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে ছুটে আসার বিষয়টি তার কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়; এটি তাকে ভারি চমৎকৃত করে- সে কেন আমার কাছে এল! ইয়েস, এটাই পয়েন্ট- দ্য ক্লু হাইডস হিয়ার, আই থিঙ্ক। রোগী মনোরোগ-বিশেষজ্ঞের কাছে নিজে এসেছে বা কেউ তাকে এখানে আসার পরামর্শ দিয়েছে, সেটা ইমপর্ট্যান্ট নয়; তার আসাটাই ইমপর্ট্যান্ট। মশার কামড়ের বিষয়টির সাথে মনোদৈহিক কোনো সম্পর্ক আছে কিনা, সেটা সজ্ঞানে জানার কথা নয় রোগীর। তবে তার অবচেতন মন বা ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয় তাকে পরোক্ষে এ বিষয়ে আভাস দিতে পারে বলেই তিনি আমার কাছে এসেছেন- এসব ভেবে তিনি গোলদারকে প্রশ্ন করেন: মি. গোলদার, আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন? আমি কি মশা মারার ডাক্তার?

গোলদার কী জবাব দেবেন তাই ভাবছেন। এমন সময় তার বুকের মধ্য থেকে হঠাৎ কে যেন ক্ষীণ-কণ্ঠে কথা বলে ওঠে: বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়...

– কী হলো, মি. গোলদার? কী ভাবছেন, কথা বলছেন না কেন?

মি. গোলদার এবারও কিছু বলতে পারেন না- কী যেন বলার জন্য চেষ্টা করে মুখভঙ্গি করেন, কিন্তু শব্দসহযোগে না-হওয়ায় তা ভাষায় রূপান্তরিত হতে পারছে না। প্রবল অস্বস্তিতে তিনি কেবল ঘামতে থাকেন। মনখুলে কথা বলতে না-পারার যে কী যন্ত্রণা তা তিনি হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছেন। শেষমেষ নিজের বুকের দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করেন।

– কী! বুকের মধ্যে কিছু হয়েছে? ব্যথা করছে? বামদিকে?

ডাক্তার হারুনের উপর্যুপরি প্রশ্নে এবার যেন হারানো ভাষা ফিরে আসে মি গোলাদারের: আমার বুকের গহিন থেকে....

– কী?

– যেন কেউ বলছে: বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়।

ডাক্তার হারুনের বুঝতে দেরি হয় না মি. গোলদারের আসল সমস্যা কোথায়। ভীষণ এক মানসিক যন্ত্রণায় পিষ্ট হয়ে কেবলই মশার কামড় খেয়ে চলেছেন তিনি। কী সেই সমস্যা সেটি আগে জানা দরকার। তবে মি. গোলদারকে কিছুই বুঝতে দেওয়া যাবে না। তাই হঠাৎ ডাক্তার হারুন প্রসঙ্গ পালটে অন্যরকম হয়ে যান। ফাল্গুনের ফুরফুরে হাওয়ায় যেন তিনি ভেসে যাবেন, এমন খোশমেজাজে বলেন: ভাই গোলদার, চলুন আমার সাথে। আজ আর রোগী দেখতে ভালো লাগছে না। আজ আপনার সাথে পার্কে বেড়াব, খাব আর গল্প করব। কখনো পাকা-বেঞ্চিতে বসে মন উজাড় করে দেব। জানেন, আমার সাথে কেউ গল্প করতে চায় না। ভাবে- মনের রোগের ডাক্তার গল্পের কী বোঝে? হ্যাঁ রে ভাই- আমার স্ত্রী তো তাই-ই বলে। আমারও যে মন বলে একটা কিছু আছে এবং আমারও যে গল্প করতে ইচ্ছে করে, তা কী কেউ বুঝতে চায়!

গোলদার ভারি অবাক হন ডাক্তার সাহেবের কথা শুনে। এতবড় একজন নামি ডাক্তার, তিনি তার সাথে এমন বন্ধুর মতো মনখুলে কথা বলছেন! ডাক্তারের জন্য তার মনে সমবেদনা জাগে, দুঃখ হয়। আর কী আশ্চর্য! এতে তার মনের মধ্যে জমে থাকা দুশ্চিন্তার কালো মেঘগুলো যেন একটু-একটু করে উবে যেতে থাকে। মশার কামড়ের আতঙ্কও আর মনে আসে না তার। নরম গলায় বলেন: আপনার প্রস্তাব শুনে ভারি ভালো লাগছে, ভাই। আমারও খুব ভালো লাগবে সন্ধ্যেটা আপনার সাথে পার্কে কাটাতে। সেই কবে যে শেষবার পার্কে বেড়াতে গিয়েছি, ভালো করে মনে পড়ে না। জানেন ডাক্তার ভাই, তখনো আমার বিয়ে হয়নি। চুটিয়ে প্রেম করছি বান্ধবী কেয়ার সাথে। সেকি উথালপাথাল প্রেম! সবকিছু উজাড় করে দেওয়া কাণ্ডকারবার আর কী! কিন্তু তার সাথে বিয়ে হলো না শেষমেষ; বড়লোকের একমাত্র মেয়ে রিনিকেই বিয়ে করতে হলো মা-বাবা-আত্মীয়স্বজনের চাপে। শুধু চাপই-বা বলি কেন, অর্থের লোভও পেয়ে বসেছিল আমাকে। আমি কেয়া'র পাগলকরা ভালোবাসা উপেক্ষা করে একদিন রিনির গলায় মালা পরালাম। রিনির বাবার অর্থসম্পদ আমার কাছে সাতরাজার ধনের মতো মনে হয়েছিল সেদিন; আর তার নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল একটি সরল মেয়ের ভালোবাসা আর বিশ্বাস। সেই থেকেই আমার মধ্যে কেমন এক অস্বস্তি। গভীর রাতে আমাদের অন্তরঙ্গ মুহূর্তে হঠাৎ মনে হতো- রিনি নয়, কেয়াই আমার বুকের নিচে। তার অদৃশ্য-অশরীরী অনুভব আমার কত রাতের সুখ যে নষ্ট করে দিয়েছে, কী আর বলব ডাক্তার সাহেব! আমার এত যে প্রাচুর্য- টাকাপয়সা-গাড়ি-বাড়ি, স্ত্রী-সন্তান, তবুও কখনো কখনো মনে হয় আমি ভারি নিঃস্ব, অসহায়, অসুখী...

গোলদারের কথার লাগাম টেনে ধরেন ডাক্তার হারুন। তার মুখে মৃদু

হাসি। তার কৌশল যে গোলদারের ওপর এত তাড়াতাড়ি কার্যকর হবে, তা তিনি ভাবেননি। অস্থির-অশান্ত গোলদারকে এখন দারুণ ফুর্তিবাজ আর চিন্তাহীন মনে হচ্ছে। ডাক্তার ব্যস্তভাবে বলেন: চলুন, চলুন গোলদার ভাই। এখনি সব গল্প বলে দিলে পার্কের জন্য কী থাকবে? চলুন বেরিয়ে পড়ি। বলেই ডাক্তার হারুন গোলদারকে সাথে নিয়ে নিচে নামতে থাকেন। গোলদার কী চমৎকারভাবে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছেন দেখে ডাক্তার খুব খুশি হন। ভাবেন: সত্যিই তাকে 'বনের বাঘে' নয়, 'মনের বাঘে' শেষ করেছে। এই 'বাঘ'টা মারাই এখন চ্যালেঞ্জ।

চেম্বারের নিচে দুজনেরই গাড়ি পার্ক করা। ড্রাইভারদের বললেন এখানে অপেক্ষা করতে। তারা সময়মতো তাদেরকে ডেকে নেবেন- বলেই হাঁটা জোড়েন পার্কের দিকে। আধাকিলোমিটার দূরের পার্কে তারা হেঁটে যাবেন! দুই ড্রাইভারেরই চোখ ছানাবড়া। দুই ড্রাইভার যার যার মনে ভাবছে, কিন্তু কেমন করে যেন তা একই ভাবনা হয়ে একই বিন্দুতে মিলে যায়- যে সাহেবরা কখনো দশ-পা হাঁটেননি, তারা হাঁটবেন আধাকিলোমিটার পথ! কী ঘটনা!

কোন অসুখ করেনি তো তাদের? দুজনের চোখেই একই জিজ্ঞাসা, একই কৌতূহলের উদ্ভাস।

পার্কে যাওয়ার পথে একঠোঙা ডাবল-চেম্বারের বা দুই দানাওয়ালা বাদাম কিনলেন ডাক্তার হারুন। পশ্চিম পাশের গেট দিয়ে পার্কে ঢুকে খানিকক্ষণ হাঁটলেন তারপর খানিকটা উত্তর দিকে নিরিবিলি স্থান বেছে নিলেন তারা। একটা পাকা বেঞ্চিতে বসতে যাবেন, এমন সময় গোলদার ডাক্তার হারুনের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় জিভ কাটতে কাটতে দুচোখ বন্ধ করেন দুহাতে। দুটি তরুণ-তরুণী পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে তাদের ভালোবাসার ছাপ রাখছে ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে। ডাক্তারও তা দেখলেন একপলক। তারপর হাসতে হাসতে বললেন: গোলদার ভাই, এ দেখে আপনি লজ্জা পাচ্ছেন? পাবারই কথা; কারণ, ওরা আর আমরা বয়সের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে অবস্থান করছি- আপনি পঞ্চান্নয়, আমি পঞ্চাশে। বয়সের এই ভিন্নতা রুচি, আনন্দ আর দুঃখবোধের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতির প্রকাশ ঘটাবে- এটাই স্বাভাবিক। এ কারণে তরুণ-তরুণীদের কাছে যা আনন্দের, আমাদের কাছে তা অস্বস্তি আর লজ্জার। সুতরাং আপনি যে লজ্জায় জিভ কাটলেন, কারণ, আপনার মানসিক অবস্থা এখন নরমাল লেভেলে...

– আপনি এর মধ্যে ভালো লাগার কী দেখলেন, ডাক্তার ভাই! এ তো স্রেফ বেহায়াপনা...

– আমি সেদিকে যাচ্ছি না। আমি বলতে চাচ্ছি- আপনার সেন্স লেভেল একদম স্বাভাবিক হয়ে গেছে, তাই আপনি লজ্জা পেয়েছেন...

– তাতে কী হলো, ভাই?

– অনেককিছু হলো, মি. গোলদার। আপনি আমাকে পাঁচহাজার টাকা ফি দিয়েছেন, তা কিন্তু আমি ভুলিনি...

– কিসের মধ্যে কী! এখানে পাঁচহাজার টাকা ফি'র কথা বলে আমাকে খোঁটা দিচ্ছেন...

– আরে না না, ভাই। খোঁটা না। শোনেন, পার্কে এসে আপনি যেভাবে মন খুলে সবকিছু উপভোগ করছেন, তরুণ-তরুণীর রোমান্টিক দৃশ্য দেখে যেভাবে লজ্জা পাচ্ছেন- এসবই আপনার শত্রু মশাদের নিপাত করার দাওয়াই। আচ্ছা, আপনি কি আগে কখনো এভাবে পার্কে বা নদীর ধারে কিংবা দূরে কোথাও নিরিবিলি অবসর সময় কাটিয়েছেন?

– না, সময় কোথায়, তিনটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান চালাতে হয়। কয়েকহাজার কর্মী। হাজারো হ্যাপা। বউ-বাচ্চাদেরই সময় দিতে পারি না, আবার বেড়ানো...

– কেয়া'র কথা কি মনে পড়ে?

মি. গোলদার এতক্ষণ বেশ উৎফুল্ল ছিলেন। ফুরফুরেও লাগছিল। কিন্তু কেয়া'র প্রসঙ্গ আসায় তিনি আবার চুপসে গেলেন। মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। বিশাল এক পাথর যেন হঠাৎ চেপে বসে তার বুকের ওপর। কানে শুনতে থাকেন একদঙ্গল মশার ব্যস্ত ভুনভুন শব্দ- দুয়েকটি কামড়ও কি পড়ল পিঠে বা হাতে! নিজের অজান্তে ডান হাত দিয়ে চটাশ করে থাপ্পড় মারেন বাম বাহুর উপরদিকে। কিন্তু কোথায় মশা? কিচ্ছু তো নেই! তবুও চারপাশে অদৃশ্য মশাদের ভুনভুনানি বেড়ে যায়; যেন কোটি কোটি রাক্ষুসে মশা তার শরীরের সব রক্ত চুষে খাওয়ার জন্য দলবেঁধে উড়ে আসছে শব্দ করে। গোলদার ভয়-আতঙ্কে দুহাতে দু'কান ঢেকে পাগলের মতো চিৎকার করে ওঠেন: ওরা আসছে... আমাকে মেরে ফেলবে... আমাকে বাঁচান, ডাক্তার সাহেব! আমাকে... বলতে বলতে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। ডাক্তার হারুন নিজের কোলের ওপর গোলদারের মাথাটা রেখে হাত বুলিয়ে দেন। কিছুক্ষণ পর গোলদার আস্তে আস্তে চোখ মেলেন, তাতে তখনো আতঙ্কের ছাপ। ডাক্তার ভাবেন- কেয়ার সাথে করা কঠিন অবিচার আর অমানবিক প্রতারণা গোলদারকে সবসময় কুরে কুরে খাচ্ছে; কখনোই তিনি এই অপরাধের কথা ভুলতে পারেন না- এটি খুবই পজিটিভ লক্ষণ। অনুশোচনার আগুনে পুড়েই তিনি তার অপরাধ তথা 'মনের বাঘ' নামক দুরারোগ্য ব্যাধিকে পরাজিত করতে পারবেন বলে ডাক্তার নিশ্চিত। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন- আর দেরি করা ঠিক হবে না; তাতে রোগীর অবস্থা নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে। তাই এখনই সরাসরি চিকিৎসায় চলে যেতে হবে। মুখে বললেন: গোলদার ভাই, চোখ খুলুন। আপনার অসুখের ডায়াগনোসিস হয়ে গেছে, এখন ট্রিটমেন্ট। কোন ভয় নেই- আপনি ঠিক হয়ে যাবেন, তবে...

– তবে? তড়াক করে উঠে বসেন গোলদার: তবে? তবে কি, ডাক্তার সাহেব?

– আপনার রোগ জটিল, কিন্তু চিকিৎসা সিম্প্‌ল। তবে...

– আবার তবে? অস্থির কণ্ঠস্বর গোলদারের।

– তবে, তারজন্য আপনার সহযোগিতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

– বলুন, ডাক্তার সাহেব।

– আপনার রোগ আপনার মনেই। কেয়া'র সাথে আপনি যে অন্যায় করেছেন, তা গুরুতর। তার সাথে যোগ হয়েছে আপনার কঠোর পরিশ্রম আর অবিরাম টাকার নেশায় ছোটা। দুয়ে মিলে আপনার মনের সবুজ-শ্যামল খেতটা একেবারে খটখটে চষাখেত হয়ে গেছে; যার জন্য মশা তো মশা, রয়েল বেঙ্গল টাইগার আপনাকে আক্রমণ করলেও আমি অবাক হতাম না।

– তাহলে শরীরে মশার কামড়ের দাগড়া-দাগড়া দাগ? ওগুলো কী?

– স্রেফ অ্যালার্জি, নাথিং এল্‌স। তার জন্য ওষুধ আছে, কিন্তু 'মনের বাঘ' মারার দাওয়াই আপনার হাতে, তবে উপায় বাতলে দেব আমি। তার আগে বলুন- কেয়া এখন কোথায়?

– এই শহরেই আছে। অনেকদিন পর বিয়ে করেছে ধনী বিপত্নীক এক প্রৌঢ়কে। আমি অনেকবার তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি; তার হাতে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিতে চেয়েছি, কিন্তু সে একবারও আমার ফোন রিসিভ করেনি। তার বাসার ঠিকানা জোগাড় করে সেখানে গিয়েছিলামও একদিন। কিন্তু ঢুকতে পারিনি। দারোয়ান আমার ভিজিটিং কার্ড নিয়ে ভেতরে কেয়ার কাছে দিলেও অনুমতি মেলেনি ঢোকার। এখনো মাঝে মাঝে ফোন দিই, কিন্তু নো রেসপন্স। ডাক্তার সাহেব, আই অ্যাম এক্সট্রিমলি স্যরি- আমি অনেক বড় অন্যায় করেছি কেয়ার সাথে। এই অন্যায় আর অপরাধের ভার আমি আর বইতে পারছি না, ডাক্তার সাহেব! আমি বুঝতে পারিনি ভালোবাসায় প্রতারণা মৃত্যুর চেয়েও ভারী আর যন্ত্রণাদায়ক।

– আপনি কেয়ার কাছে ক্ষমা চাইতে চান?

– অবভিয়াসলি! অফকোর্স- অবশ্যই তাই চাই। আপনি পারবেন ব্যবস্থা করতে! গভীর-নিখাদ মিনতি গোলদারের কণ্ঠে।

– চেষ্টা তো করতে হবেই। আপনি নিরাশ হবেন না। আপনার অনুশোচনাবোধ যদি নিখাদ হয়, তাহলে আপনি সফল হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

সন্ধ্যে ঘোর হয়ে এসেছে। চমৎকার আলোছায়ার খেলা গাছগাছালিতে ছাওয়া পার্কজুড়ে। রহস্যময়, রোমান্টিক আর একধরনের ভালোলাগার ছোঁয়া চারদিকে। তারা হেঁটে হেঁটে পার্কের গেট পেরিয়ে টিএসসির সামনে দাঁড়ালেন। দু'প্লেট ফুচকা খেলেন। তারপর ড্রাইভারদের ফোনে ডাকলেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ড্রাইভার দু'জন হাজির। গাড়িতে ওঠার আগে ডাক্তার হারুন বলেন গোলদারকে: কেয়ার ফোন নাম্বারটা দিন।

কাসেম গোলদার ব্যস্তভাবে ডাক্তারকে কেয়ার ফোন নাম্বার দেন। তখন ডাক্তার বলেন: মি. গোলদার, এখন বাড়ি যান। কাল ঠিক বিকেল পাঁচটায় আমার চেম্বারে চলে অসবেন। বলেই গাড়িতে উঠে পড়েন। গাড়ি চলতে শুরু করে। গোলদার কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে তারপর নিজের গাড়িতে উঠলেন। সারাটা রাস্তা তিনি একটি কথাও বললেন না। তবে মশার ভুনভুনানি এখন আর শুনতে পাচ্ছেন না তিনি।

পরদিন পাঁচটার আগেই মি. গোলদার ডাক্তারের চেম্বারে পৌঁছে গেলেন। ডাক্তার গোলদারকে হাসিমুখে রিসিভ করলেন। তারপর বললেন: তা মি. গোলদার, রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল তো?

– জি, হয়েছিল।

– কোন মশা এসেছিল? কামড় দিয়েছিল?

– না, ডাক্তার সাহেব।

– কেয়ার সাথে আমার কথা হয়েছে। আপনার কথা তাকে খুলে বলেছি। সব শুনে তিনি আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন...

– কেয়া আমাকে ক্ষমা করেছে, ডাক্তার সাহেব? ওহ্ খোদা! আমার কেয়া আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে!

ফুরফুরে মেজাজে বাড়ি ফিরে এলেন কাসেম গোলদার। প্রথমেই ঘরে গেলেন না। সোজা চলে গেলেন রিনির প্রিয় কদম গাছের তলায়। রিনি যেখানে বসে সেখানে একটি শিকড়ের ওপর বসেন।

এদিকে রিনির যে আজ কী হয়েছে- অকারণ পুলকে তিনি বেশামাল হয়ে পড়ছেন বারবার। তবুও সংযত থাকার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না। সংকোচের বিহ্বলতায় তিনি আর দাঁড়াতে পারেন না; তাড়াতাড়ি সরে যান ছেলেমেয়েদের হাসিময় মুখচোরা চাউনির সামনে থেকে- বলা যায়, পালিয়ে বাঁচলেন। তিনি গিয়ে থামলেন তার প্রিয় কদম গাছের রোমান্টিক আলোছায়ায়, যেখানে স্বপ্নের নায়কের মতো বসে আছেন মি. গোলদার। রিনি কাছে আসতেই উঠে দাঁড়ান গোলদার। গাঢ়কণ্ঠে বলেন: মশারা বোধহয় আমাকে আর কামড়াবে না। ওরা তো বাঘ হয়ে আমার মনের মধ্যেই ছিল- ডাক্তার বলেছে। আমার মনে হয়, আমার শাপমুক্তি ঘটেছে, রিনি। আমার বুকের ওপর থেকে এক নিরেট পাথর নেমে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

গোলদারের কেয়া-কাহিনি, তার মানসিক উদ্বেগ সব রিনির জানা। কিন্তু এ নিয়ে কখনো প্রকাশ্যে কোন অনুযোগ-অভিযোগ তোলেননি তিনি। রিনির এই কঠিন সহিষ্ণুতা আর প্রতিবাদহীন নীরবতাই গোলদারকে দিনে দিনে আরো বেশি অস্থির করে তুলেছে, অসুস্থ করে দিয়েছে। কিন্তু আজ আর রিনি নীরব থাকলেন না। প্রথম প্রেমেপড়া উচ্ছল তরুণীর মতো তার গাঢ় কণ্ঠস্বর: আই লাভ ইউ, গোলদার!– বলেই স্বামীর ঠোঁটে ঠোঁট লাগান গাঢ় মমতায়। সেই মুহূর্তে গোলদারের মনে হয়, তার ভালোবাসার কেয়া দূর থেকে তাকে বলছে: রিনিকে আর অবহেলা করো না। তোমার ভালোবাসা এতদিন আমার কাছে বাঁধা থাকলেও গতকালই আমি সেই বন্দি পাখিটাকে মুক্ত করে দিয়েছি। তুমি ওকে ভালোবাসো, যেমন আমাকে বাসতে। এখন থেকে কোনো মশা আর তোমাকে কামড়াবে না। ডিয়ার, এনজয় রিনি উইথ কমপ্লিট লাভ। গুডলাক মাই ফ্রেন্ড!

লেখক: কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

জাগো বাহে কোনঠে সবায়

ফজিলা ফয়েজ

"জাগো বাহে কোনঠে সবায়" এই সংগ্রামী স্লোগান রংপুর অঞ্চল থেকে যেন বারবার জেগে ওঠে তীব্র আকারে, সারাদেশ বারুদের মত জ্বলে। এই বিদ্রোহী স্লোগান রংপুরকে গৌরবান্বিত করে ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নিয়েছে শতবছর আগেই। রংপুরের তেজি সন্তানরা কেউ লড়াই করে প্রাণ দিয়েছে আবার কেউ স্বেচ্ছায় বুক পেতে রুখে দাঁড়িয়েছে স্বাধীনতার জন্য। "জাগো বাহে কোনঠে সবায়" সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং প্রতিরোধের চেতনাকে ধারণ করে রংপুর অঞ্চলকে সংজ্ঞায়িত করেছে। অধিকারের জন্য দাঁড়ানো স্লোগানটি জনগণের শক্তি, ঐক্য, ন্যায় এবং সাম্যের জন্য তাদের অব্যাহত লড়াইয়ের একটি শক্তিশালী অনুস্মারক।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন নূরলদীন থেকে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রথম শহিদ শঙ্কু সমজদার, শহিদ জননী জাহানারা ইমাম, নারী জাগরণের অগ্রদূত মহীয়সী বেগম রোকেয়া, আরো অনেকে। রংপুরের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা দৃঢ়তা আর সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

যেমন করে জেগে উঠেছিল আজ থেকে প্রায় আড়াইশ' বছর আগে ইংরেজদের শোষণ এবং লুণ্ঠনের সহযোগী এবং গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এর প্রিয়পাত্র দেবী সিংহের ভয়াবহ অত্যাচার-নির্যাতনে রংপুর এবং দিনাজপুর অঞ্চল যখন মৃতপ্রায়। দেবী সিংহ ছিলেন ইংরেজ মনোনীত এই অঞ্চলের ইজারাদার। তার অসহনীয় অত্যাচার ও অন্তহীন অবাধ লুণ্ঠনে রংপুর এবং দিনাজপুর অঞ্চল পরিণত হয়েছিল শ্মশানে। চারিদিকে ভেসে বেড়াচ্ছিল অসহায় কৃষকদের হাহাকার আর গগণভেদী দীর্ঘশ্বাস। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে অসহায় হরিণও ঘুরে দাঁড়ায়, এই অঞ্চলের নিরীহ এবং নির্বিবাদী কৃষকরাও তেমনি ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। খনির ঘন অন্ধকার থেকে যেমন করে উঠে আসে উজ্জ্বল হীরকখণ্ড, তেমনি সাধারণ কৃষকদের মধ্য থেকে উঠে আসেন এক অসামান্য মানুষ, একজন অমিতবিক্রমশালী সিংহ-হৃদয় পুরুষ নূরলদীন। ১৭৩০ সাল এবছরই এই অনন্য মানুষটি দেবী সিংহকে করে তোলেন নেংটি ইঁদুরের মতো ভীত, অসহায়। রংপুরের বুকে নূরলদীনের যে বিপ্লবের লাল আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, তাকে নির্বাপিত করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে। আর যাকে কেন্দ্র করে এই বিদ্রোহ, সেই দেবী সিংহকে রংপুর ছেড়ে পালাতে হয়েছিল।

জনগণের চূড়ান্ত জয় হয়ত হয়নি সেদিন, কিন্তু এই মানুষ জেগেছিল, নিজেকে চিনেছিল সেদিন। যা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে সগৌরবে।

১৭৬৭ সালের ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন- রংপুর, রাজশাহী, কুচবিহার, জলপাইগুঁড়ি ও কুমিল্লা জেলায় বিদ্রোহীদের আক্রমণ তীব্রতর হয়ে ওঠে। উত্তরবঙ্গে বিদ্রোহীদের তৎপরতা প্রতিহত করার জন্য ১৭৬৭ সালে ক্যাপ্টেন ডি. ম্যাকেঞ্জির অধীনে রংপুরে ইংরেজ বাহিনী প্রেরিত হয়। এসময় মালদহের ইংরেজ রেসিডেন্ট বারওয়েল কর্তৃক মার্টলের নেতৃত্বে প্রেরিত একটি ইংরেজ বাহিনী বিদ্রোহীদের নিকট পরাজিত হয় এবং সেনাপতি মার্টল নিহত হন। ম্যাকেঞ্জির বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে বিদ্রোহীরা নেপালের দিকে পশ্চাদপসরণ করে। রংপুর, বৃহত্তর দিনাজপুর ও বিহার সংলগ্ন অঞ্চলে সন্ন্যাসী ও ফকিরেরা বিদ্রোহে জড়িয়ে পড়েছিলেন। মূলত এখানে বাংলার কৃষক, মজুর ও প্রান্তিক মানুষজনও সেই কর্মকাণ্ড সমর্থন করেছেন। ১৭৬৩ সালে ফকির ও সন্ন্যাসীদের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা হয়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে আলোচ্য বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করে যা বাংলা জনপদের প্রথম ব্রিটিশবিরোধী স্বতন্ত্র আন্দোলন

এছাড়া নারী জাগরণের অগ্রদূত মহীয়সী বেগম রোকেয়া রংপুরকে ইতিহাসের পাতায় দিয়েছেন নতুন উচ্চতা। শিক্ষা ছাড়া নারীমুক্তি হতে পারে না, আর নারীমুক্তি ছাড়া কখনও একটি সভ্য সমাজ গড়ে উঠতে পারে না, এ নিগূঢ় সত্যটা অনুধাবন করেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন খ্যাতিমান বাঙালি সাহিত্যিক ও সমাজসংস্কারক। বেগম রোকেয়ার পূর্বে তৎকালীন অন্ধকারাচ্ছন্ন সামাজিক অবস্থায় অন্য কোনো ব্যক্তিত্ব নারীদের উন্মেষ নিয়ে বলিষ্ঠ ও সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি। তাই বেগম রোকেয়াকে আমরা নারী জাগরণের অগ্রদূতরূপে গণ্য করি। বেগম রোকেয়ার সংগ্রাম ছিল মূলত দুই ধরনের, একদিকে ঘুমন্ত নারী সমাজকে জাগিয়ে তোলা, অন্যদিকে সামাজিক কুসংস্কারমুক্ত পরিবেশ তৈরি করা। তাঁর এ সংগ্রাম কখনও পুরুষের বিরুদ্ধে ছিল না বরং নারীর প্রতি পুরুষের মানসিকতার পরিবর্তনই ছিল তাঁর কাম্য। তাই তিনি লিখেছিলেন, 'আমরা সমাজের অর্ধাঙ্গ, আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোনো ব্যক্তি এক পা বাঁধিয়া রাখিলে সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে। তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা আমাদের লক্ষ্য তাহাই।'

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহিদ রংপুরের শঙ্কু সমজদার। তাঁর আত্মত্যাগের বিনিময়ে মানুষের মনে স্বাধীনতার চেতনা ও আকাঙ্ক্ষা দৃঢ় হয়। শঙ্কু সমজদারের জীবন ও আত্মত্যাগ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। ৭০' এর নির্বাচনের পর সারাদেশের মতো উদ্বেলিত হয়েছিল রংপুরের মানুষ। ইয়াহিয়া খান একাত্তরের ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করলেও ১ মার্চ তা স্থগিত হওয়ার প্রতিবাদে ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ রংপুরে হরতাল পালিত হয়। শহরের কাচারি বাজার থেকে সকাল সাড়ে নয়টার দিকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলে রংপুর কৈলাশ রঞ্জন স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র শঙ্কু সমজদারও অংশ নেন। মিছিলটি জাহাজ কোম্পানির মোড় হয়ে স্টেশনের দিকে এগুতে থাকলে পুলিশ গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই শহিদ হন শঙ্কু সমজদার।

২০২৪ সালের ৫ জুন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ২০১৮ সালের ৪ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকারের জারি করা পরিপত্রকে অবৈধ ঘোষণার পর পুনরায় কোটা সংস্কার আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবে শুরু হলেও ক্রমে এটি ব্যাপক আকার ধারণ করে। প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রংপুর রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়-সহ সারা বাংলাদেশ ও অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাও আন্দোলনে যোগ দেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে শিক্ষার্থীরা 'বাংলা ব্লকেড' নামে অবরোধ কর্মসূচি পালন শুরু করেন।

১৬ জুলাই আন্দোলন চলাকালে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ক আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন। এ আন্দোলনের তিনিই প্রথম শহিদ। তাঁর মৃত্যুই বদলে দেয় আন্দোলনের গতিপথ। পুলিশের কঠোর অবস্থানের মুখে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বেশিরভাগই পিছু হটেন এবং আশপাশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নেন। কিন্তু তাদের মধ্যে আবু সাঈদ পুলিশের সামনে গিয়ে বুক চিতিয়ে পুলিশের দিকে দাঁড়িয়ে থাকেন। পুলিশ তাঁর দিকে রাবার বুলেট ছুড়লে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মাটিতে বসে পড়েন। আন্দোলনকারীদের কয়েকজন তাঁকে উদ্ধার করে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। শহিদ আবু সাঈদের শরীরে একাধিক রাবার বুলেটের ক্ষত ছিল।

শহিদ আবু সাঈদের গ্রামের বাড়ি রংপুরে পীরগঞ্জ উপজেলার বাবনপুর গ্রামে। প্রবল দেশপ্রেম, অমিত তেজ ও সাহসী নেতৃত্বের সম্মিলনে তিনি যে আত্মত্যাগের নজির রেখে গেছেন তা বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের সংস্কার আন্দোলনের শক্তিশালী প্রেরণা। আবু সাইদ ছাত্রজীবনের এক লড়াকু বীরের নাম। আর সেটাই যুগে যুগে সাহস এবং প্রেরণা যোগাবে ভবিষ্যতের গণবিদ্রোহ এবং জন-আন্দোলনকে। আবু সাঈদ এর বোন সুমির আহাজারিতে বাংলার আকাশ বাতাস ভারি হয়। আহাজারি করতে করতে বলতে থাকেন- "হামার মাও-বাপের কত আশা, হামার ছেলি একটা চাকরি করবি। ভাইডে হামার মরি গেল। হামার মাও এখন কেঙ্গিরি বাঁচে।"

ভাইয়ের অকালমৃত্যুর ঘটনায় আক্ষেপ করে তিনি বলছিলেন, "তার হাতোত কোনও অস্ত্র আছিল না। তার পাও দুডো ভাঙি দিলো না, হাত একটা ভাঙি দিল না। আমরা চিকিৎসা করি কথা বলি দুডো শান্তি পানু। ভায়োক হামার এভাবে মারাডা ঠিক হয় নাই। এর বিচার চাই।" অন্যদিকে, সন্তানকে হারিয়ে পাগলপ্রায় আবু সাঈদের মা মনোয়ারা বেগম। আক্ষেপের সুরে বলেন, "হাসিনা মোর বেটাক মারি ফালালি।"

কিন্তু আবু সাঈদ যে সময়ের নূরলদীন। গৌরবের রংপুরে জন্ম নেওয়া নূরলদীন থেকে আবু সাইদ পর্যন্ত এক একটি নাম ইস্পাতসম কঠিন, অগ্নিশিখার অমিত আহবান। তাঁর আছে আমার দেশের মাটির গন্ধের সাথে মিশে থাকা মাতাল এক অনুভূতি, আছে কালো পূর্ণিমায় রক্তলোলুপ হায়েনার হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য গগণবিদারী কণ্ঠে ডেকে ওঠা এক প্রতিধ্বণির আশ্বাস 'জাগো বাহে কোনঠে সবায়।'

লেখক: প্রাবন্ধিক ও উন্নয়নকর্মী

ছবি: নীলা আহসান, আশাশুনি, সাতক্ষীরা

শিশু কিশোর পাতা

তরু পল্লব

শরতের সাজ

নকুল শর্ম্মা

শরৎ এল আকাশ জুড়ে
সাদা মেঘের ভেলা,
মাঠের পথে নদীর কূলে
কাশফুলেরই মেলা।

ভাই-বোন মিলে দেখছে চেয়ে
শরতেরই সাজ,
রেলের গাড়ি চলছে ছুটে
চলাই যে তার কাজ।

পূজোয় যাবে মামার বাড়ি
রেলগাড়িতে চড়ে,
সেই আশাতে মনে ওদের
খুশির নাচন ধরে।

পূজোর গন্ধ আসছে ভেসে
কাশের বনে বনে,
বছর ঘুরে শরৎ এল
খুশির দোলা মনে।

ভালোবাসি

মো. তাইফুর রহমান

আমি খুকু ভালোবাসি বাংলাদেশের মাটি
কী চমৎকার আমার এ দেশ! খুবই পরিপাটি।
বাংলাদেশে জন্ম আমার বাংলায় বলি কথা
আমি খুকু ভালোবাসি সবুজ তরুলতা।

ভালোবাসার টানে ছুটি সবুজ-শ্যামল মাঠে
কৃষক ভাইয়ের মুখে হাসি সোনার ফসল কাটে।
ফড়িংছানা খেলা করে সবুজ ঘাসের বুকে
বাংলামায়ের কোলে থাকি, দিন কেটে যায় সুখে।

ফুলের মেলায় যাই হারিয়ে মনে প্রেমের ছন্দ
আমি খুকু ভালোবাসি ফুলের মিষ্টি গন্ধ।
আমি খুকু ভালোবাসি প্রজাপতির খেলা
আকাশ পানে চেয়ে দেখি শুভ্র মেঘের ভেলা।

আমি খুকু ভালোবাসি ডানামেলা পাখি
ইচ্ছে হলেই রং-তুলিতে দেশের ছবি আঁকি।
শান্ত নদীর রূপ দেখে ভাই আমি দিশেহারা
আমি খুকু ভালোবাসি নীল আকাশের তারা।

ছবি:

তানহা চাদনী

ষষ্ঠ শ্রেণি,

পিরোজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

ভাদ্রমাসে

মুহাম্মদ আলম জাহাঙ্গীর

প্রকৃতিটা সবুজ শ্যামল
আকাশ নীলাভ সাদা,
মেঘের ভেলা উড়ে পড়ে
দূর পাহাড়ে বাঁধা।
শিমের মাঁচায় শালিক ছানা
কিচিরমিচির করে,
শালিক ছানা ধরতে শিশুর
মন থাকে না ঘরে।
তাল পাকে আর বরই পাকে
ডেউয়া চালতা জলপাই,
দেশি স্বাদের ফল খেলে ভাই
শরীরে ঢের বল পাই।
শিউলি জবা নয়নতারা
শাপলা শালুক ফোঁটে,
ফুল কুড়াতে শিশু-কিশোর
ফুলের বনে ছোটে।
মৌমাছি আর প্রজাপতি
ফুলের মধু খেতে,
এ ফুল হতে ও ফুলে ভাই
ওঠে দারুণ মেতে।
মাঠে ঘাটের পানি ভাদ্রে
একটু করে কমে,
দাড়কা পুঁটি টেংরা টাকি
স্বল্প পানিতে জমে।
ধানের চারা করতে রোপন
কৃষক জমি চাষে,
টাপুরটুপুর পুকুর নদী
ধরায় ভাদ্রমাসে।

শিশু অনুকরণপ্রিয়

জেসমিন সুলতানা চৌধুরী

তাহান সোনা খুব আদুরে
স্বর্ণালি সেই দিন,
কোল থেকে কোল বেড়ায় ঘুরে
নাচে তা ধিন ধিন।

মাম্মা-বাব্বা এসব ছাড়া
কিছুই জানে না,
তবুও বাবার মাইক্রোফোনে
গায় সুরে অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ।

নিজের জুতো পা-য় রাখে না
বাপের জোড়া পা-য়,
হাঁটতে গিয়ে আছাড় খেয়ে
নাকটা ফেটে যায়।

মায়ের হাতের কলম নিয়ে
লিখতেও সে চায়,
ল্যাপটপেও দক্ষ সমান
পড়তে বসা দায় ।

এইভাবে ঠিক সকল শিশু
একটু একটু বাড়ে,
বলতে শেখে পড়তে শেখে
দৃষ্টি সবার কাড়ে।

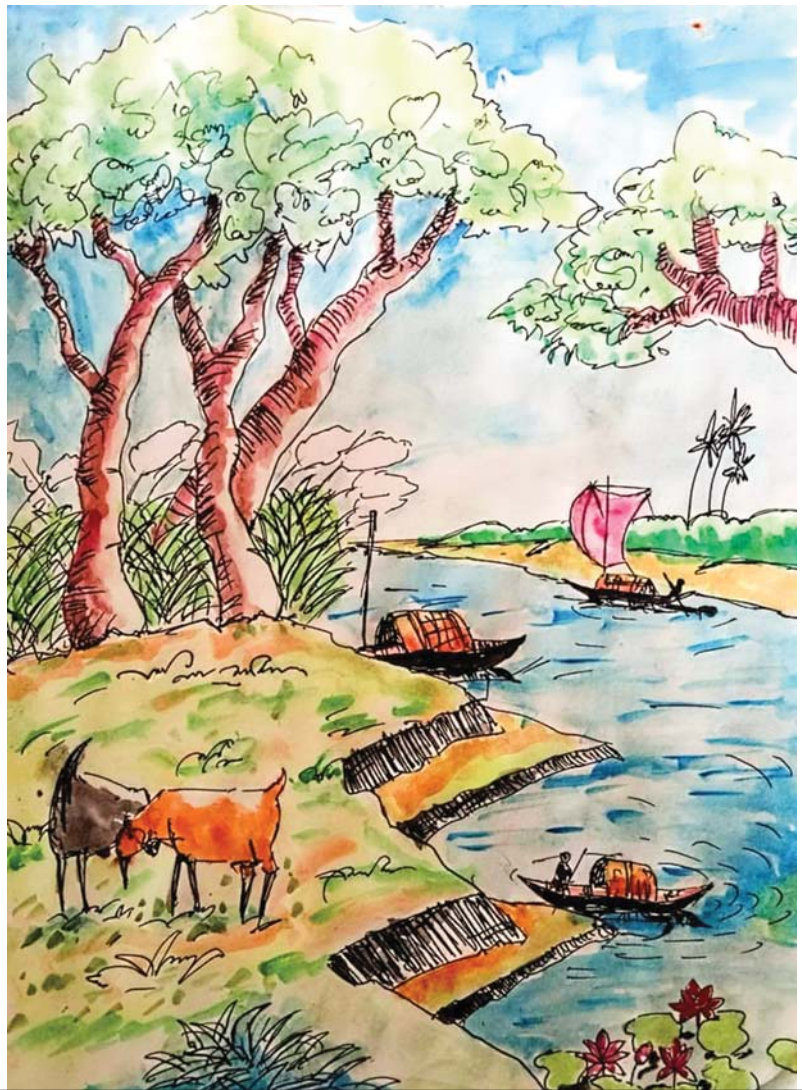

ছবি:
তাসকিন হোসেন
আশাশুনি, সাতক্ষীরা

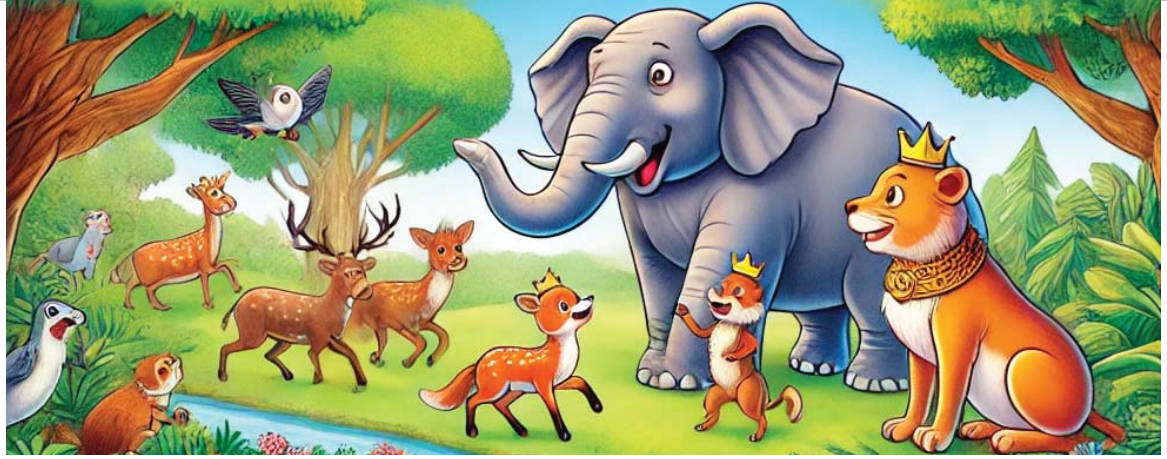

একতাই শক্তি

আবদুল লতিফ

বনের রাজা সিংহের বয়স হয়ে যাওয়ায় তার শরীরে আর আগের মতো শক্তি ছিল না। তাই যখন তখন গরু, মহিষ, ভেড়া, হরিণ ইত্যাদি ধরে ধরে খাওয়ার সামর্থও তখন তার কমে যায়। শিকার ধরতে না পেরে খাদ্যের অভাবে ধীরে ধীরে সে আরও দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল আর চিন্তাও প্রকট হচ্ছিল। পাশেই ছিল বিশাল বড় আরও একটা জঙ্গল। সেই জঙ্গলের রাজার সাথে সিংহের ছিল ভালো বন্ধুত্ব। একদিন সেই বন্ধুর কাছে গেল, যদি কোনো উপায় বের করা যায় সেই আশায়। বন্ধু ঠিকই একটা দারুণ পরামর্শ দিল। বলল, জঙ্গলে ফিরে তোমার প্রধান কাজ হলো জঙ্গলের অন্যান্য প্রাণিকুলে তাদের নিজেদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে দেওয়া। আর সেই কাজে তোমাকে সাহায্য করতে পারে শিয়াল পণ্ডিত।

ফিরে এসেই কাকের মাধ্যমে শিয়ালকে খবর পাঠাল সিংহ। চিঠিতে শিয়ালকে লিখল, তুমি যদি আমার পাশে থাক তাহলে তোমার চৌদ্দপুরুষ রাজার হালে চলতে পারবে আর আমার অনুপস্থিতিতে তুমিই হবে এই বনের রাজা।

শিয়াল পণ্ডিত রাজার কাছে জানতে চাইল, করণীয় কী? রাজা বললেন, জঙ্গলের প্রাণিদের মধ্যে এমনভাবে বিভাজন তৈরি করতে হবে যাতে তারা নিজেদের দ্বন্দ্বের কারণে নিজেদেরকেই ধরে ধরে আমার কাছে দিয়ে যায়। এতে করে আমাকে খাবারের জন্য আর কষ্ট করতে হবে না। বিনিময়ে তুমি তোমার ইচ্ছেমতো জঙ্গলের যেকোনো পশুপাখি ধরে ধরে খাবে, কেউ কিছু বলার সাহস পাবে না। লোভী শিয়াল প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। সে সত্যি সত্যিই প্রাণিদের মধ্যে এমন দ্বন্দ্ব তৈরি করে দিল যে, সারাক্ষণই তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি, মারামারি, দলাদলি চলতেই থাকে আর একদল অন্যদলের কাউকে ধরতে পারলেই শান্তিস্বরূপ সিংহের হাতে তুলে দেয়। এভাবেই চলতে থাকল, সিংহের খাবারের আর অভাব রইল না বরং অতিরিক্ত খাবার শিয়ালের আত্মীয়-স্বজনদের দিয়ে দিত।

এভাবে বনের রাজা সিংহ এবং তার সহচর ধূর্ত শিয়ালের দিনকাল বেশ ভালোই চলছিল। কিন্তু এভাবে বেশিদিন চলতে পারল না। জঙ্গলের বুড়ো এক মহিষ বিষয়টা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখল, আসলে শিয়াল আর সিংহ মিলে অন্য প্রাণিদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে নিজেরা মজা লুটছে। একদিন সে প্রাণিগোত্রের মুরুব্বিদের অনুরোধ করল তার সঙ্গে দেখা করতে। বুড়ো মহিষের অনুনয়-বিনয়ে তারা একত্রিত হলে মহিষ সবকিছু বুঝিয়ে বলল- দেখো, আমরা ছোটখাটো বিষয় নিয়ে নিজেরা বিবাদে জড়িয়ে পড়ছি এবং নিজেদেরই কোনো আত্মীয়-স্বজনকে তুলে দিচ্ছি সিংহের হাতে এবং সিংহ আর শিয়াল মিলে মজা করে তাদের খাচ্ছে! অথচ আমাদের জঙ্গল এমন ছিল না, আমাদের সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। সবাই মনযোগ দিয়ে বুড়ো মহিষের কথা শুনল। সব শুনে বৃদ্ধ হরিণ আফসোস করে বলল, আমার এখন অনেক বয়স হয়েছে, যেকোনো দিন মরে যেতে পারি কিন্তু আমাদের সমাজকে এই অবস্থায় রেখে গেলে মরেও শান্তি পাব না।

মহিষ আরও বলল, আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি এটা সিংহ এবং শিয়ালের ষড়যন্ত্র, আপনারা কি বুঝতে পারছেন? সবাই সমস্বরে চিৎকার করে হ্যা বলল। তখন মহিষ সবাইকে উদ্দেশ করে বলল, আমি মনে করি এখন আমাদের মধ্যে একতা দরকার। কারণ একতাই শক্তি, একতাই বল। সব ভুল বোঝাবুঝি পেছনে ফেলে আমাদের এক হয়ে সিংহ এবং শিয়ালের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। সবাই তাতে সম্মতি জানালে মহিষ বলল, তাহলে আপনারা আপনাদের গোত্রের সবার সাথে আলোচনা করে আগামীকাল আবার এখানেই আসবেন এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করব।

পরদিন সবাই আবার মিলিত হয়ে তাদের গোত্রের সকলের সম্মতির কথা জানাল এবং সিদ্ধান্ত নিল পরবর্তী মঙ্গলবার দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ছোট বড় সব প্রাণি মিলে সিংহ এবং শিয়ালের উপর একযোগে আক্রমণ চালাবে এবং সেই আক্রমণ হবে- ডু অর ডাই। হাতি বলল, প্রয়োজনে যারা ছোট এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল তারা আমার পিঠে চড়ে যাবে কিন্তু অবশ্যই সবাইকে অংশগ্রহণ করতে হবে। যেই কথা সেই কাজ। নির্ধারিত সময়ে সকলের সমবেত আক্রমণে অধিকাংশ শিয়ালই মারা পড়ল, কেউ পালিয়ে গিয়ে জানে বাঁচল। কিন্তু এই জঙ্গলের আশেপাশে আর থাকতে পারল না। আর সিংহ! কেউ বলে পালাতে গিয়ে জলে ডুবে মারা গেছে, কেউ বলে পাশের জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে ঐ জঙ্গলের রাজার দাসত্ব গ্রহণ করছে। অতঃপর উপস্থিত মুরুব্বি প্রাণিদের পরামর্শে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে হাতিকে জঙ্গলের রাজা বানিয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

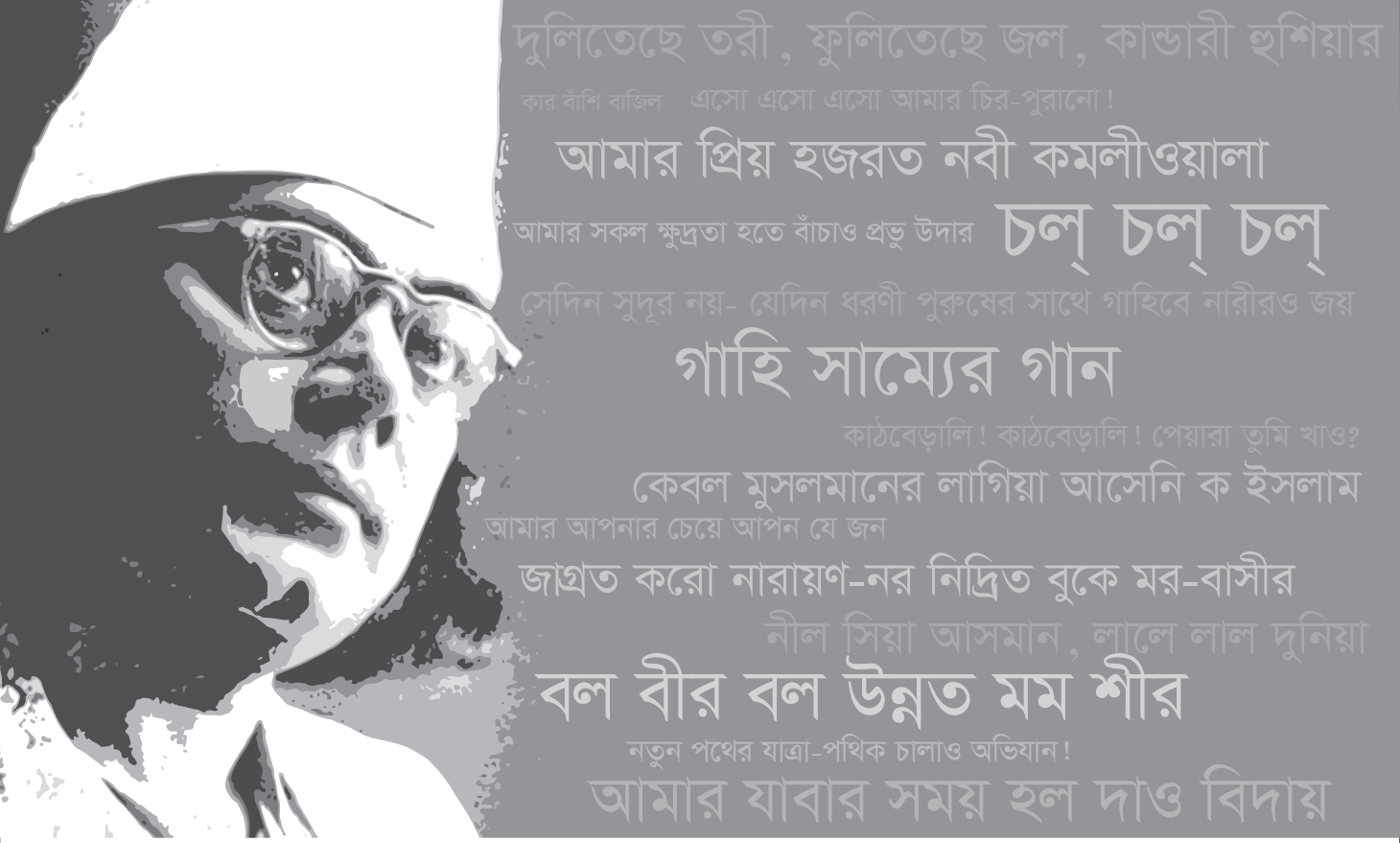

কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতারের বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা

২৭ আগস্ট ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ, ১২ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

নিশুতি অধিবেশন

ঢাকা-খ: মধ্যম তরঙ্গ ৮১৯ কিলোহার্জ (এফএম ১০২ মেগাহার্জ)

রাত

১২-১৫ বাঁধনহারা: নিশুতির নাটক
মূল রচনা: কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ: ড. তারিক মনজুর
প্রযোজনা: এস এ আবুল হায়াত

ঢাকা-ক: মধ্যম তরঙ্গ ৬৯৩ কিলোহার্জ (এফএম ১০৬ মেগাহার্জ)

সকাল

৮-৩০ দর্পণ: জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
খ. কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতি বিজড়িত স্থান নিয়ে প্রামাণ্য প্রতিবেদন: শুভাশিষ ভৌমিক
ঘ. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা: শিমুল মুস্তাফা
ঙ. বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস ও গল্পে কবি কাজী নজরুল ইসলামের অবদান নিয়ে কথিকা
চ. নজরুল সংগীত: প্রিয়তম হে বিদায়
গ্রন্থনা: লালটু হোসাইন
উপস্থাপনা: লালটু হোসাইন ও তাহমিদা হান্নান
প্রযোজনা: মোঃ দুলাল হোসাইন

৯-০৫ বাগিচায় বুলবুল: শিশু-কিশোরদের বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. প্রাসঙ্গিক কথা
খ. নজরুল সংগীত: খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে
গ. ঝিঙ্গেফুলের কবি নজরুল বিষয়ক আসরভিত্তিক আলোচনা
পরিচালনা: কাজী সাকেরা বানু (কাজী ডেইজি)
ঘ. নজরুল সংগীত: বাগিচায় বুলবুলি তুই
ঙ. কবিতা: চড়ুই পাখির ছানা
চ. বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনি থেকে অংশবিশেষ পাঠ
ছ. নজরুল সংগীত: ছন্দের বন্যা হরিণী অরণ্য
গ্রন্থনা: আনজির লিটন
উপস্থাপনা: মারজুকা বিনতে নাহিয়ান বিভা ও খোন্দকার তালাল
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

১০-০৫ মনে ও মননে নজরুল: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: ড. মঞ্জুরুল হক
প্রযোজনা: মাহফুজুল ইসলাম

১০-৩০ স্মরণ পাড়ের ওগো প্রিয়: বিশেষ গীতিআলেখ্য
গ্রন্থনা, উপস্থাপনা ও সংগীত পরিচালনা: এম এ মান্নান
প্রযোজনা: রাকিবা কবির ও মোঃ মনিরুজ্জামান

বেলা

১১-০৫ প্রজন্মকণ্ঠ: নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে
প্রাসঙ্গিক কথা
ক. কবিতা: বিদ্রোহী, আবৃত্তিতে: আফনানুল হাসান
খ. প্রজন্ম ভাবনা: নজরুল তারুণ্যের প্রতীক এ বিষয় সম্পর্কে
তরুণ প্রজন্মের ভাবনা নিয়ে ভক্সপপ: ইসহাক আলী
গ. তথ্যের সন্ধানে: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের
মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে নানা আয়োজন নিয়ে খবরাখবর
ঘ. কথিকা: বিদ্রোহ আর প্রেমের কবি নজরুল
রচনা ও পাঠে: মোঃ আরিফুল হক
ঙ. নজরুল সংগীত
গ্রন্থনা: আয়েশা সিদ্দিকা মনি
উপস্থাপনা: আয়েশা সিদ্দিকা মনি ও সাদিউর রহমান সাদি
প্রযোজনা: ড. সায়লা আকতার

৩-০৫ নাটক: বিদায়ের বীণা (বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনি গল্প অবলম্বনে)
মূল রচনা: কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ ও প্রযোজনা: আল জাবির

বিকাল

৫-১০ তোমারে পড়িছে মনে: কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মীর মাসরুরুজ্জামান
প্রযোজনা: নাদিয়া ফেরদৌস

রাত

৯-০০ উত্তরণ: বেতার ম্যাগাজিন
ক. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের
মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. বিশ্ববিচিত্রা: কাজী নজরুল ইসলামের বেতার জীবন
সংগ্রহ ও সংকলন: মোঃ মাহবুব হাসান
গ. কবিতা: কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা গানের আড়াল
ঘ. কথিকা: চলচ্চিত্রে নজরুল, কথক: ড. লুৎফর রহমান
ঙ. নজরুল সংগীত: আমারে দেবনা ভুলিতে
চ. বই পরিচিতি: কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস মৃত্যুক্ষুধা
গ্রন্থনা: ইকবাল খোরশেদ
উপস্থাপনা: আজহারুল ইসলাম রনি ও আফরোজা পারভীন কনা
পাণ্ডুলিপি পাঠ: স্নিগ্ধা সোহানা হক
প্রযোজনা: নাদিয়া ফেরদৌস

ঢাকা- খ: মধ্যম তরঙ্গ ৮১৯ কিলোহার্জ (এফএম ১০২ মেগাহার্জ)

সকাল

৭-৩০ মহানগর: ঢাকা মহানগর কেন্দ্রিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের
মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. আলাপচারিতা: গানে কবিতায় নজরুল
গ. নজরুল উদযাপনে নগরী: জাতীয় কবি কাজী নজরুল
ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য অনুষ্ঠানমালা
ঘ. কথিকা: সাম্য ও প্রেমের কবি নজরুল
রচনা ও পাঠে: ড. তারিক মনজুর
ঙ. নজরুল সংগীত
গ্রন্থনা: তামান্না সিদ্দিকী
উপস্থাপনা: মোঃ মহসীন মিয়া ও শিউলী রানী বালা
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

সন্ধ্যা

৭-০৫ বাগিচায় বুলবুল: শিশু-কিশোরদের বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. প্রাসঙ্গিক কথা
খ. নজরুল সংগীত: খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে- সায়মা শারমিন ইমা
গ. ঝিঙেফুলের কবি নজরুল বিষয়ক আসরভিত্তিক আলোচনা
পরিচালনা: কাজী সাকেরা বানু (কাজী ডেইজি)
ঘ. নজরুল সংগীত: বাগিচায় বুলবুলি তুই- সমবেত কণ্ঠে
ঙ. কবিতা: চড়ুই পাখির ছানা, আবৃত্তি: সমৃদ্ধি সূচনা
চ. বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনি থেকে অংশবিশেষ পাঠ: সুমায়তা
আজিজ রিমঝিম
ছ. নজরুল সংগীত: ছন্দের বন্যা হরিণী অরণ্য- দিব্যময় দেশ
গ্রন্থনা: আনজির লিটন
উপস্থাপনা: মারজুকা বিনতে নাহিয়ান বিভা ও খোন্দকার তালাল
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

৭-৪০ তোমারে পড়িছে মনে: কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মীর মাসরুরুজ্জামান
প্রযোজনা: নাদিয়া ফেরদৌস

৮-০০ নাটক: বিদায়ের বীণা (বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনি গল্প অবলম্বনে)
মূল রচনা: কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ ও প্রযোজনা: আল জাবির

৯-০০ মনে ও মননে নজরুল:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: ড. মঞ্জুরুল হক
প্রযোজনা: মাহফুজুল ইসলাম

৯-৩০ স্মরণ পাড়ের ওগো প্রিয়: বিশেষ গীতিআলেখ্য
গ্রন্থনা, উপস্থাপনা ও সংগীত পরিচালনা: এম এ মান্নান
প্রযোজনা: রাকিবা কবির ও মোঃ মনিরুজ্জামান

নারীরে প্রথম দিয়াছি মুক্তি নর- সম অধিকার
আমার মনের পিয়াল তমালে হেরি তারে স্নেহ-মেঘ-শ্যাম
আজ রঙ্গ এলো রক্তপ্রাণের অঙ্গনে মোর চারপাশে
শারদ-প্রাতে কমলবনে তোমার নামে মধু পিয়ে
প্রাণ-চঞ্চল প্রাচী-র তরুণ, কর্মবীর

বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম

সকাল

৯-১০ প্রজাপতি: শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও পরিচালনা: নাজনীন হক
শিশু-উপস্থাপক: ইসাবা সামিহ
ক. নজরুলের ছেলেবেলা নিয়ে শিশুতোষ আলোচনা: আনোয়ারা বেগম
খ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি: মাশিয়াত মোর্শেদ ও ইসাবা আফিহ
গ. নজরুল সংগীত: সমবেত কণ্ঠে
ঘ. শিশুদের চোখে নজরুল: প্রামাণ্য ধারণ: তাসকিয়াতুন নুর তানিয়া
প্রযোজনা: শাহীন আকতার

বেলা

৩-৩০ আমি গাই তারি গান: বিশেষ গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: রুমি বড়ুয়া চৌধুরী
উপস্থাপনা: উম্মে কুলসুম
প্রযোজনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী

বিকাল

৫-৪০ গাহি সাম্যের গান: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আবদুল মতিন
প্রযোজনা: শাহীন আকতার

রাত

৯-১০ সংবাদ তরঙ্গ: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে চট্টগ্রামে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে বিশেষ বেতার বিবরণী
বহিঃপ্রচার ধারণ: সুনপ তালুকদার
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জামিল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী
প্রযোজনা: এ এস এম নাজমুল হাছান

১০-০০ নজরুল সাহিত্যে দেশপ্রেম: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: ড.প্রকাশ দাশগুপ্ত
অংশগ্রহণ: ড. মোঃ নেয়ামত উল্যাহ ভূঁইয়া ও মুহিবউল্লাহ
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

১০-৩০ বাদল বরিষণে: বিশেষ নাটক
গল্প: কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ: অশোক কুমার চৌধুরী
প্রযোজনা: মোঃ মঈন উদ্দিন

বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

সকাল

৬-৩০ আমি চির তরে দূরে চলে যাব: নজরুলের গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ফেরদৌস সিরাজুম সানজিদা
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

৯-০৫ বিদ্রোহী দুখু মিয়া: শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ড. শিরিন আখতার
ক. নজরুলের শিশুতোষ রচনায় নজরুলের শৈশবের প্রভাব- মাহামুদা আখতার
খ. নজরুল সংগীত: একি অপরুপ রুপে মা তোমার- শফিকুল হাসানাত সিয়াম
গ. নজরুলের শিশুতোষ কবিতা আবৃত্তি (সংকল্প): মৌমিতা প্রামানিক
ঘ. নজরুল সংগীতের সুরে গিটার: যে চলে গেছে- সুপ্রভাত সরকার চারু
ঙ. নজরুলের শিশুতোষ কবিতা আবৃত্তি: চড়ুই পাখির ছানা- এস এম হাসান ইমাম
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস

৯-৪৫ চোখের জলে লেখা: নির্বাচিত কবিতার গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সুখেন কুমার মুখার্জী
প্রযোজনা: দেওয়ান আবুল বাশার

বেলা

১২-১৫ পরজনমে দেখা হবে প্রিয়: গীতিআলেখ্য
গ্রন্থনা: মো. আলমগীর পারভেজ
সংগীত পরিচালনা: অসিত রায়
ধারাবর্ণনা: রুখসানা আক্তার লাকী
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

বিকাল

৫-১০ বহুমুখী সাহিত্য-প্রতিভা নজরুল: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: তানিয়া তহমিনা সরকার
অংশগ্রহণ: ড. আবুল হাসান চৌধুরী ও ড. শিখা সরকার
প্রযোজনা: এস এম নাদিম সুলতান

রাত

১০-০০ শিউলিমালা: নাটক
বেতার নাট্যরূপ: সুখেন কুমার মুখার্জী
প্রযোজনা: মোঃ হাসান আখতার (পুন:প্রচার)

বাংলাদেশ বেতার, খুলনা

সকাল

৮-৩০ আকাশে আজ ছড়িয়ে দিলেম: বিশেষ গীতিআলেখ্য
গ্রন্থনা: দীপঙ্কর ঘোষ
সংগীত পরিচালনা: শেখ আলী আহমেদ
ধারাবর্ণনা: নাসিরুজ্জামান
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

৯-০৫ সবুজ পাতার দেশে: ছোটদের বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শাহীনা আক্তার
ক. নজরুলের ছোটবেলা: অধ্যাপক আব্দুল মান্নান
খ. নজরুল সংগীত: পিউ মল্লিক ও ঋতু কবিরাজ
গ. নজরুলের কবিতা আবৃত্তি: সানিকা সুলতানা
ঘ. একক অভিনয়: জায়ান খান
ঙ. দলীয় পরিবেশনা: এবং আবৃত্তি সাংস্কৃতিক সংগঠন
প্রযোজনা: মোঃ আশিকুর রহমান রাজীব

বেলা

৩-৩০ নজরুল সাহিত্যে প্রেম ও দ্রোহ: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: রোকসানা রহমান
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

বিকাল

৪-৩৫ খেলিছো এ বিশ্ব লয়ে: গোষ্ঠীভিত্তিক সংগীতানুষ্ঠান
পরিবেশনা: সৃজনী সংগীত একাডেমি, খুলনা
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

৫-১০ আসিবে বলে সুদূর অতিথি: কবিতা আবৃত্তির (নজরুলের সকণ্ঠে কবিতাসহ) অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আফরোজ জাহান চৌধুরী কলি
প্রযোজনা: মোঃ আশিকুর রহমান রাজীব

১০-০০ জীবনের বাদশা: বিশেষ নাটক
বেতার নাট্যরূপ: অশোক কুমার বিশ্বাস
প্রযোজনা: মোঃ ইলিয়াস হোসেন সরদার

বাংলাদেশ বেতার, রংপুর

সকাল

৬-৩৫ প্রভাত বীণা তব বাজে: নজরুল সংগীতের অনুষ্ঠান

৭-৩০ সঞ্চিতা: নজরুল সংগীতের অনুষ্ঠান

৯-৩০ ফিরোজিয়া ফুল: শিশু-কিশোরদের গীতিআলেখ্য
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মুনজারীন আহসান রোদেলা
সংগীত পরিচালনা: চম্পক কুমার
প্রযোজনা: মোছা: ফারহানা আর্জুমান বানু

দুপুর

১২-১৫ ফিরিয়া যদি সে আসে: নজরুল সংগীতের বিশেষ অনুষ্ঠান

বেলা

১-৩০ তোমারে পড়িছে মনে: কবিতা পাঠের বিশেষ অনুষ্ঠান:
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ড. নাসিমা আক্তার
প্রযোজনা: মোছা. ফারহানা আর্জুমান বানু

৩-০৫ নজরুলের সৃষ্টিশীলতা: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: ড. তুহিন ওয়াদুদ, ড. রিষিন পরিমল ও ড. শফিকুর রহমান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা: ড. সরিফা সালোয়া ডিনা
প্রযোজনা: মোছা. ফারহানা আর্জুমান বানু

বিকাল

৫-১০ আমারে দেবো না ভুলিতে: বিশেষ গীতিআলেখ্য:
গ্রন্থনা: তমাল কান্তি লাহিড়ী
উপস্থাপনা: মুনিরা শাহনাজ চৌধুরী কেয়া ও রাফিউজ্জামান সরকার
প্রযোজনা: মৃন্ময় মণ্ডল তুষার

বাংলাদেশ বেতার, সিলেট

সকাল

৬-৩৫ আমারে দেব না ভুলিতে: নজরুল সংগীতের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: নিখিল রঞ্জন মজুমদার
উপস্থাপনা: রুহিত আচার্য্য
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৮-৩০ বিচিত্রা: প্রভাতি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক আলোচনা
খ. বাঙালির কবি কাজী নজরুল ইসলাম: ড. আব্দুর রহিম
গ. নজরুল সংগীত: শূন্য এ বুকে- ইয়াকুব আলী খান
ঘ. দ্রোহে বিদ্রোহে কবি নজরুল: অধ্যাপক তাপসী চক্রবর্তী
গ্রন্থনা: এম এ হোসেন
উপস্থাপনা: রিফাত আরা ও মিথুন চন্দ্র দাস
প্রযোজনা: মোঃ দেলওয়ার হোসেন

৯-২০ ছোটদের কবি নজরুল: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
ক. নজরুলের ছেলেবেলা: শিশুতোষ আলোচনা- অধ্যাপক কাজী আতাউর রহমান
খ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি: ওয়াফিদ আল দাইয়ান
গ. সমবেত নজরুল সংগীত:

ঘ. কাজী নজরুল ইসলামের শিশুতোষ রচনা:
অধ্যাপক তাপসী চক্রবর্তী
ঙ. সমবেত নজরুল সংগীত
গ্রন্থনা: কামরুন্নাহার শফিক
উপস্থাপনা: সামিহা সালসাবিন খান ইকরা
প্রযোজনা: মোঃ দেলওয়ার হোসেন

দুপুর

১২-১৫ আজকের সংবাদপত্র: জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্রের শিরোনামের (কবি নজরুলের মৃত্যুবার্ষিকীসহ) উপর ভিত্তি করে পর্যালোচনা মূলক অনুষ্ঠান
পর্যালোচনা: ইকবাল সিদ্দিকী
উপস্থাপনা: আল আজাদ
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

বেলা

২-০৫ অঞ্জলি লহ মোর: ফেসবুকভিত্তিক গান ও কবিতার বিশেষ অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: নাজমা পারভীন
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৩-১০ আমার যাবার সময় হলো: নজরুল সংগীত শিল্পীদের অংশগ্রহণে গীতিআলেখ্য
গ্রন্থনা: মতিন্দ্র সরকার
উপস্থাপনা: মিথুন চন্দ্র দাস
সংগীত পরিচালনা: দেবাশীষ বন্দোপাধ্যায়
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৩-৪০ পথের স্মৃতি: কাজী নজরুল ইসলাম রচিত কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
পরিচালনা: মোকাদ্দেস বাবুল
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

বিকাল

৫-৩০ বাঙালির কবি নজরুল: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: অসিত বরণ দাশ গুপ্ত
অংশগ্রহণ: প্রফেসর ড. আবুল ফতেহ ফাত্তাহ, প্রফেসর সুনীল ইন্দু অধিকারী, প্রফেসর আঞ্জুমান আরা বেগম ও বিপ্রদাস ভট্টাচার্য্য
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

রাত

৯-০৫ সাহিত্য অঙ্গন: সাহিত্য বিষয়ক অনুষ্ঠান
ক. সিলেটে নজরুল: কথিকা- আ ফ ম সাঈদ
খ. নজরুল সংগীত: আমায় নহে গো- ঝুমকোলতা সিন্‌হা ঝুমা
গ. নজরুলের মানুষ কবিতা আবৃত্তি: নন্দিতা দত্ত
ঘ. নজরুলের রাজনৈতিক দর্শন: কথিকা- লিয়াকত শাহ ফরিদী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মোঃ ফয়সল উদ্দিন
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

১০-০০ মৃত্যুক্ষুধা: বিশেষ নাটক
মূলগল্প: কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ: মোঃ শমসের হোসাইন
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

সকাল

৭-৩০ কেন আনো ফুলডোর বিদায় বেলা: নজরুল সংগীতের অনুষ্ঠান

৮-৩০ ঝিঙ্গেফুল: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে আলেখ্যানুষ্ঠান
ক. নজরুল সংগীত: মোহনা বেপারী ও সাইয়ারা সায়ান
খ. নজরুলের কবিতা আবৃত্তি: তাহিরা বারী ও মোঃ দিদারুল ইসলাম
গ. নজরুল সংগীত: নবনীল নন্দী ও সিমন বিশ্বাস তৃণা
গ্রন্থনা: শেখ কামরুন নাহার কাদির
বর্ণনা: অর্পিতা দাস
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

১০-০৫ নজরুল সাহিত্যে বহুমাত্রিকতা: আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: প্রফেসর মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, পম্পা রানী মজুদার ও মোঃ হাফিজুর রহমান
সঞ্চালনা: মোহসিনা হোসাইন
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

বিকাল

৪-২০ মনে রেখো আমায়: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গীতিআলোখ্য
গ্রন্থনা: মাহাবুবা হুসাইন চৌধুরী
সংগীত পরিচালনা: মোঃ জহুরুল হাসান তালুকদার
বর্ণনা: জান্নাতুল ফেরদৌস
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

৫-১৫ মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: পাপিয়া জেসমিন
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

৫-৩০ নজরুল সংগীত: ফিরোজা বেগম

সন্ধ্যা

৬-৩৫ আমারে দেব না ভুলিতে: নজরুল সংগীতের অনুষ্ঠান

রাত

১০-৩০ অঞ্জলি লহ মোর: নির্বাচিত নজরুল সংগীতের অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও

সকাল

৯-৩০ ঝিঙেফুল: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: দিলীপ কুমার সাহা
উপস্থাপনা: সাবরিনা ফারিন অথৈ
সঙ্গীত পরিচালনা: ঠান্ডা রাম বর্মন
ক. দিবসভিত্তিক কথা: পরিচালক
খ. দুখু মিয়ার শৈশব (গল্পাকারে আলোচনা): ফাহমিদা রহমান শম্পা
গ. নজরুল সঙ্গীত (সমবেত কণ্ঠে)
ঘ. কাজী নজরুলের কবিতা আবৃত্তি: মুহাইমিম ইসলাম অহনা
ঙ. অভিনয়- অবন্তি সাহা প্রাপ্তি
চ. নজরুল সংগীত: শর্মিলী রায় সিমি
প্রযোজনা: দেওয়ান আবুল বাশার

১০-৩০ অসাম্প্রদায়িক ও সাম্যবাদী নজরুল: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: মোস্তাক আহমেদ
অংশগ্রহণ: অধ্যাপক মনোতোষ কুমার দে, বেগম জান্নাতুন নাহার ও আলী মনসুর
প্রযোজনা: দেওয়ান আবুল বাশার

বিকাল

৫-১০ ভালোবাস মোর গান: নজরুল সংগীতের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: স্বপ্না শর্মা
উপস্থাপনা: আশরাফুল আলম শাওন
প্রযোজনা: দেওয়ান আবুল বাশার

৫-৩০ বিদ্রোহী রণক্লান্ত: গোষ্ঠীভিত্তিক অনুষ্ঠান
পরিবেশনা: অতপর সাহিত্যগোষ্ঠী, ঠাকুরগাঁও
প্রযোজনা: দেওয়ান আবুল বাশার

সন্ধ্যা

৬-১০ বিদায় স্মরণে: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আঞ্জুমান আরা কলি
প্রযোজনা: দেওয়ান আবুল বাশার

বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার

সকাল

১০-০৫ মনে রেখ আমায় জ্যোৎস্নার মত: গ্রন্থনাবদ্ধ নজরুল সংগীতের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রুবিনা আকতার
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

১০-৩০ নারী মহল: নারীসমাজের জন্য ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শরমিন ছিদ্দিকা
ক. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি: লিপিকা ধর
খ. কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যে নারী, পুরুষ সাম্যবাদ: নাজমা পারভীন উর্মি
গ. নজরুল সংগীত: নিপা ভট্টচার্য্য
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

বেলা

১১-১০ বাবুদের তালপুকুরে: শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আব্দুল্লাহ আবরার হাকিম
ক. নজরুল এর কবিতা থেকে আবৃত্তি: নুযহাত রহমান ওয়ারিশা
খ. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের শিশুতোষ লেখা নিয়ে আলোচনা: আহসানুল হক
গ. নজরুল সংগীত: পুষ্পি দাশ
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

দুপুর

১২-১০ এল খেয়া পার: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নীলোৎপল বড়ুয়া
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

বেলা

১-৩৫ অসাম্প্রদায়িক কবি নজরুল: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: অজিদ দাশ ও ক্যাথিং অং রাখাইন
পরিচালনা: জসিম উদ্দিন বকুল
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

২-৩০ যেন মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পায়: নজরুল সংগীতের অনুষ্ঠান

৩-০৫ ঝিলিমিলি: বিশেষ নাটক
নির্দেশনা: স্বপন ভট্টাচার্য্য
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

৩-৩৫ ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে: বিশেষ গীতিআলেখ্য
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: পরীক্ষিৎ বড়ুয়া
সংগীত পরিচালনা: বশিরুল ইসলাম
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

বাংলাদেশ বেতার, রাঙামাটি

সকাল

৮-১০ অসাম্প্রদায়িক চেতনার কবি নজরুল: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ফাতেমা জান্নাত মুমু
অংশগ্রহণ: তাছাদ্দিক হোসেন কবির, মো: মহিউদ্দিন ও মুহিবুল্লাহ
প্রযোজনা: মো: সেলিম

৮-৪০ তবু আমারে দেবনা ভুলিতে: কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মো: ফখরুজ্জামান
প্রযোজনা: মো: জাকারিয়া সিদ্দিকী

৯-২০ আমি চিরতরে দূরে চলে যাব: গীতিআলেখ্য
গবেষণা ও গ্রন্থনা: দুলাল চৌধুরী
উপস্থাপনা: মনীষা ও কাওসার
প্রযোজনা: মো: জাকারিয়া সিদ্দিকী

বেলা

২-৩৫ আগামী: শিশু-কিশোরদের জন্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: কলি চাকমা
ক. নজরুলের কবিতা আবৃত্তি: আরুশা তাসনিম
খ. কথিকা: নজরুলের গল্পে শিশু- শাহনাজ নাসরিন
গ. নজরুলের গান পরিবেশনা: ইউমি বড়ুয়া
ঘ. নজরুলের গল্প অভিনয়: শ্রেষ্ঠা দেব
ঙ. নজরুলের কবিতা আবৃত্তি: শেখ আজিরন সাদিয়া তনয়া
প্রযোজনা: মো: জাকারিয়া সিদ্দিকী

৩-০৫ অগ্রপথিক: যুবসমাজের জন্য অনুষ্ঠান
উপস্থাপনা: প্রত্যুষ চাকমা
ক. নজরুলের কবিতা আবৃত্তি: জান্নাতুল ফেরদৌস তমালিকা, নুরে নাজিবা নুহা
খ. দিবসভিত্তিক গান: রাইন মিস্ত্রী, ইশা ত্রিপুরা
গ. কথিকা: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের শিল্পকর্ম নিয়ে যুবভাবনা: শুভ দে
প্রযোজনা: মো: জাকারিয়া সিদ্দিকী

বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

সকাল

৭-৩০ আমি চিরতরে দূরে চলে যাবো: গানের অনুষ্ঠান

৮-১০ চির বিদায়ের বাণী: বিশেষ আলেখ্যানুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা: সঙ্গীতা দেবী
উপস্থাপনা: চন্দ্রিমা বড়ুয়া ও হারুন অর রশিদ
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

৯-১৫ সকাল বেলার পাখি: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
পরিবেশনা: ওয়াহিদুল আলম স্মৃতি একাডেমি, বান্দরবান
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

৯-৩০ অপরূপা বান্দরবান: বেতার ম্যাগাজিন
ক. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. নজরুল স্মৃতি: কাজী নজরুল ইসলামের বাংলাদেশের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি নিয়ে গবেষণামূলক নিবন্ধ
সংগ্রহ ও গ্রন্থনা: বুদ্ধজ্যোতি চাকমা
গ. কথিকা: দ্রোহের কবি নজরুল: মোঃ শওকত আযম
ঘ. কবির স্বকণ্ঠে আবৃত্তি
ঙ. নজরুল সংগীত: আমার যাবার সময় হলো, দাও বিদায়
চ. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'শিউলি মালা' নাটকের অংশবিশেষ
গ্রন্থনা: এ জেড এম আরফান হাবীব
উপস্থাপনা: আল্পনা প্রভা তঞ্চঙ্গ্যা ও মাহমুদুল হাসান
প্রযোজনা: এ বি এম রফিকুল ইসলাম

বেলা

২-০৫ শেষ সওগাত: কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
সংগীত পরিচালনা: রাজেশ সাহা
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মোঃ শওকত আযম
প্রযোজনা: মোহাম্মদ আশরাফ কবীর

২-৪০ শূন্য এই বুকে: মহিলাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. প্রাসঙ্গিক কথা
খ. কথিকা: নারী জাগরণে কবি নজরুল: ফারজান শরমিন
গ. কবিতা আবৃত্তি:
ঘ. নজরুল সংগীত: আমার আপনার চেয়ে: দয়মন্তী ধর পূজা
ঙ. কবিতা আবৃত্তি: যদি আর বাঁশী না বাজে: হোসনে আরা খানম
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: তাহিয়া রহমান
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

৩-১০ নাটক: মৃত্যুক্ষুধা
কাহিনি: কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ: আকসা ইবনে সাঈদ
প্রযোজনা: সৈয়দ শামসুর রহমান

বিকাল

৪-১০ নজরুল সাহিত্যে জীবনবোধ ও মানবতা:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: মেহেদী হাসান ও এ জেড এম আরফান হাবীব
সঞ্চালনা: মোহাম্মদ ইয়াকুব
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান

৪-৩৫ তোমারে পড়িছে মনে: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: আমিনুর রহমান প্রামাণিক
উপস্থাপনা: তাহিয়া রহমান
প্রযোজনা: এ বি এম রফিকুল ইসলাম

বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা

সকাল

৮-১০ মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিয়ো ভাই: কাজী নজরুল ইসলামের ভক্তিমূলক গান নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: সুমন চক্রবর্তী
উপস্থাপনা: সুমন চক্রবর্তী ও চৈতি দেবনাথ বৃষ্টি
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদি হাছান

৯-০৫ পত্রসাহিত্যে নজরুল: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: সুলতানা পারভীন দিপালী
অংশগ্রহণ: অধ্যাপক আবুল হাসানাত মোঃ মাহবুবুর রহমান, ফরিদা ইয়াসমিন ও ড. জি এম মনিরুজ্জামান
প্রযোজনা: মোঃ ইমরান হোসেন

৯-৩৫ ভালোবাসো মোর গান: নজরুল সংগীত নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: গুরুদাস ভট্টাচার্য্য
উপস্থাপনা: মোঃ খায়রুল বাশার বাঁধন
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদি

বেলা

২-৩০ নজরুল রচনায় নারী: নারী সমাজের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: প্রফেসর সেলিনা রহমান
উপস্থাপনা: সোহানা শারমিন রাকা
ক. নজরুল কবিতায় নারী: সুলতানা পারভীন
খ. দিবসভিত্তিক আবৃত্তি: নুসরাত জাহান চৌধুরী
গ. নজরুল সাহিত্যে নারী জাগরণ: হাছিনা আক্তার
ঘ. নজরুল সংগীত: সুলক্ষণা দাস
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদি হাছান

৩-৩০ শোষিতের কবি নজরুল: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: নুর মোহাম্মদ রাজু
অংশগ্রহণ: ড. রেজাউল ইসলাম, সুলতানা পারভীন দিপালী ও ড. জি এম মনিরুজ্জামান
প্রযোজনা: মোঃ ইমরান হোসেন

বিকাল

৪-০৫ সবুজ পাতার দেশে: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নাজমুন নাহার পূর্ণি
ক. নজরুল সংগীত: কেসমতি সাকি
খ. আমাদের দুখু মিয়া: কাজী ফারজিদা ইসলাম
গ. কবিতা আবৃত্তি: প্রজ্ঞা চক্রবর্তী
ঘ. নজরুল সংগীত: সমবেত কণ্ঠে
প্রযোজনা: মোঃ ইমরান হোসেন

৪-৩৫ যদি আর বাঁশী না বাজে: বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সাজিয়া ইয়াসমিন
ক. কাজী নজরুল ইসলামের স্ব-কণ্ঠে আবৃত্তি
খ. চিরবিরহী নজরুল: ড. সায়েদুল আল আমিন
গ. নজরুল সংগীত: তাপস কুমার দাস
ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত নাট্যাংশ
ঙ. কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা থেকে পাঠ: তাসমিয়া রহমান রাকিবা
প্রযোজনা: মোঃ ইমরান হোসেন

৫-১০ কুমিল্লায় নজরুলের স্মৃতি বিজড়িত স্থান নিয়ে প্রামাণ্য প্রতিবেদন
অনুষ্ঠান ধারণ, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মাহতাব উদ্দিন মজুমদার
প্রযোজনা: মোঃ ইমরান হোসেন

৫-৩৫ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে কুমিল্লায় আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার উপর ভিত্তি করে একটি বিশেষ বেতার বিবরণী
অনুষ্ঠান ধারণ, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মহসিন মিজি
প্রযোজনা: মোঃ ইমরান হোসেন

সন্ধ্যা

৬-০৫ বাগিচায় বুলবুলি তুই: বিশেষ গীতিআলেখ্য
গবেষণা ও গ্রন্থনা: বিমল চন্দ্র আইচ
উপস্থাপনা: স্নিগ্ধা চক্রবর্তী
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদি হাছান

৬-৩০ বাতায়ন পাশে: বিশেষ আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: উত্তম বহ্নি সেন
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদি হাছান

বাংলাদেশ বেতার গোপালগঞ্জ

সকাল

১০-০৫ আমি চিরতরে দূরে চলে যাব: গানের গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: শরিফা রহমান
উপস্থাপনা: আবুল আহসান ও শরিফা রহমান
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

বেলা

৩-০৫ সাম্য ও মানবতার কবি নজরুল: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: মোহাম্মদ আনিছুর রহমান মিঞা, শাহনাজ রেজা এ্যানি ও অসিম বাড়ৈ
সঞ্চালনা: খন্দকার সাবিনা ইয়াসমিন
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

বিকাল

৪-২০ পদ্ম গোখরো: বিশেষ নাটক
রচনা: কবি কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ: অশোক কুমার বিশ্বাস
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

৫-৪০ বিদায়-স্মরণে: কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: এস এম শফিউল্লাহ রাজ
প্রযোজনা: ফয়সাল মাহমুদ

সন্ধ্যা

৬-০৫ মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই:
ভক্তিমূলক গানের গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: সিফাত বিনতে জামান রাকা
উপস্থাপনা: মোঃ আবদুল্লাহ শেখ ও সিফাত বিনতে জামান রাকা
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ

সকাল

৮-৪০ ধূমকেতু: বিশেষ গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
ক. দ্রোহের কবি কাজী নজরুল: সংকলিত নিবন্ধ- মোঃ মুনজুর এলাহী সৌরভ
খ. বিদ্রোহী কবিতা আবৃত্তি: এনায়েত কবির সূর্য
গ. আমি যুগে যুগে আসিয়াছি: নজরুল সংগীত- সমবেত কণ্ঠে
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আঁখি আকবর রনি
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম

৯-১৫ নয়ন ভরা জল: নজরুল সংগীতের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নাদিরা জান্নাত রাঁখি
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম

৯-৪০ সঞ্চিতা: কবিতার গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম

১০-১০ পদ্মার ঢেউ: কাজী নজরুল ইসলাম রচিত পল্লিগীতির অনুষ্ঠান

১০-২০ তোরা সব জয়ধ্বনি কর: নজরুল রচিত স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান

জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল

সকাল

৭-২০ সুখের ঠিকানা:
ক. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের
মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে উপস্থাপক কর্তৃক আলোকপাত
খ. নজরুল সংগীত: মনে পড়ে আজ সে কোন: ফিরোজা বেগম
প্রযোজনা: সাহিদা মঞ্জুরী

বেলা

১১-৩০ স্বাস্থ্যই সুখের মূল
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের
মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে উপস্থাপক কর্তৃক আলোকপাত
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সুরাইয়া সুলতানা মনিরা
প্রযোজনা: মোহাম্মদ ইফফাতুর রহমান

রাত

৮-১০ সুখী সংসার
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের
মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে উপস্থাপক কর্তৃক আলোকপাত
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মো শাহীনুর রহমান
প্রযোজনা: তোফাজ্জল হোসেন

বহির্বিশ্ব কার্যক্রম

বাংলা সার্ভিস

রাত

১০.৩০ (মধ্যপ্রাচ্য)
১.১৫ (ইউরোপ)

আমারে দেবো না ভুলিতে:
ক. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের
মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. নজরুল সংগীত: খেলা শেষ হল- গোলাম সোহরাব
গ. বিশেষ সাক্ষাৎকার: স্মৃতিতে নজরুল
সাক্ষাৎকার প্রদান: খিলখিল কাজী
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: সাইফুল তানকার
ঘ. কবিতা আবৃত্তি: গানের আড়াল- মাহমুদা আখতার
ঙ. নজরুল সংগীত: আমি চিরতরে দূরে চলে যাব- ফিরোজা বেগম
গবেষণা ও গ্রন্থনা: লায়লা পারভীন কেয়া
উপস্থাপনা: লায়লা পারভীন কেয়া ও আরেফিন মাসুদ
প্রযোজনা: উম্মে রুম্মান

English Service

Between 6:30 PM & 7:00 PM
English 1st Transmission
Between 11:45 PM & 1:00 AM

English 2nd Transmission

Melancholy Papia (weinx cvwcqv)
Special Program on the Death Anniversary of
National Poet Kazi Nazrul Islam
Details of the Program:
Topic of Discussion: Melancholy Melodies of Nazrul
Participants: Shahina Akter Papia and Dahlia Ahmed
Moderator: Shamim Khan
Produced by: A Z M Riad Ali

কৃষি সার্ভিস দপ্তর

সকাল

৬-৫০ কৃষি সমাচার: কৃষি ও পরিবেশভিত্তিক অনুষ্ঠান
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর
মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে প্রাসঙ্গিক কথা
ক. নজরুল সংগীত: আমি চিরতরে দূরে চলে যাব- ফিরোজা বেগম
খ. কবিতা আবৃত্তি: সাম্যবাদী- নাসিম আহমেদ
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: পারভীন আহসান মিলি
প্রযোজনা: নুসরাত হারুন

সন্ধ্যা

৬-০৫ সোনালি ফসল: আঞ্চলিক অনুষ্ঠান
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে
প্রাসঙ্গিক কথা
ক. নজরুলের সাম্যবাদী চিন্তা ও কৃষক সমাজ: বিশেষ আলোচনা
অংশগ্রহণ: মো: আনোয়ার ফারুক ও ড. তারিক মনজুর
সঞ্চালনা: ড. মো: জাহাঙ্গীর আলম
খ. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর
মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে বিশেষ গান:
শ্যামল বরণ বাংলা মায়ের- খায়রুল আনাম শাকিল
অনুষ্ঠান পরিচালনা: মো: নজরুল ইসলাম
প্রযোজনা: নুসরাত হারুন

৭-০৫ দেশ আমার মাটি আমার: জাতীয় অনুষ্ঠান
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে
প্রাসঙ্গিক কথা
ক. নজরুল সাহিত্যে কৃষি ও কৃষক: অধ্যাপক আবু নোমান
ফারুক আহমেদ
খ. নজরুল সংগীত: মসজিদের পাশে আমায়- খালেদ হোসাইন
আসর পরিচালনা: আব্দুস সুবর খান চৌধুরী
প্রযোজনা: নুসরাত হারুন

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

সকাল

৯-৩০ কেন কাঁদে পরাণ: গ্রন্থনাবদ্ধ সংগীতানুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা: মোঃ আমিনুল ইসলাম
উপস্থাপনা: সেলিনা আক্তার শেলী ও মোঃ আমিনুল ইসলাম
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

বেলা

৩-০০ দোলনচাঁপা: বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. গান: একি অপরূপ রূপে মা তোমার হেরেনু
খ. কথিকা: নজরুল সংগীতে দেশপ্রেম
রচনা ও পাঠ: খায়রুল আনাম শাকিল
গ. নজরুলের কবিতা আবৃত্তি: লাল্টু হোসাইন
ঘ. নজরুলের নাটকের অংশবিশেষ
ঙ. ইসলামি গান
গবেষণা ও গ্রন্থনা: মোঃ আজহারুল ইসলাম
উপস্থাপনা: হাসনা ফিতরিয়া ফাহমিদা বানু ও মোঃ আজহারুল
ইসলাম
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস

বেলা

১-২৫ অসাম্প্রদায়িক চেতনার কবি নজরুল: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: জোবায়েদ হোসেন পলাশ
অংশগ্রহণ: মুহম্মদ নুরুল হুদা ও সালাউদ্দিন আহমেদ
প্রযোজনা: মো: সারোয়ার মোর্শেদ

২-০০ খুঁজি তারে আমি আপনায়: নজরুল সংগীত নিয়ে বিশেষ গ্রন্থিত
অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শায়লা রহমান
প্রযোজনা: ফারজানা

২-২০ অগ্নীবীণা: আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রযোজনা: নাসিমা বেগম

২-৪০ গানই কবিতা, কবিতাই গান: আর্কাইভ থেকে নির্বাচিত অনুষ্ঠান
নজরুলের গান ও কবিতা নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শফিকুল ইসলাম বাহার

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম

সকাল

১০-৩০ আজ বিদায়ের দিনে কেঁদো না: কবিতা নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: ড. তারিক মনজুর
উপস্থাপনা: তনিমা করিম
প্রযোজনা: ইফতেকার আলম রাজন

সন্ধ্যা

৭-০০ আমারে দেব না ভুলিতে: গান নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: ড. সৌমিত্র শেখর
উপস্থাপনা: ফারজানা আক্তার বেলী
প্রযোজনা: ইফতেকার আলম রাজন

পবিত্র ইদ-ই-মিলাদুন্নবি (স.) উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতারের বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ, ১২ রবিউল আউয়াল ১৪৪৬ হিজরি

বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

নিশুতি অধিবেশন

ঢাকা-খ: মধ্যম তরঙ্গ ৮১৯ কিলোহার্জ (এফএম ১০২ মেগাহার্জ)

রাত

১২-১৫ এলেন ধরায় আলোর নবি: বিশেষ গীতিনকশা
গীতরচনা ও গ্রন্থনা: নুরুল ইসলাম মানিক
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: আবু বকর সিদ্দিক
প্রযোজনা: রাকিবা কবির ও মোঃ মনিরুজ্জামান

ঢাকা-ক: মধ্যম তরঙ্গ ৬৯৩ কিলোহার্জ (এফএম ১০৬ মেগাহার্জ)

সকাল

৮-৩০ দর্পণ: ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. পবিত্র ইদ-ই-মিলাদুন্নবি (স.) উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
খ. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইদ-ই-মিলাদুন্নবি (স.) উদযাপন বিষয়ক নিবন্ধ: এম এ ওহাব
গ. বাংলাদেশের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী ষাটগম্বুজ মসজিদ নিয়ে নিবন্ধ: সৈয়দ শাহ এমরান
ঘ. পবিত্র ইদ-ই-মিলাদুন্নবি (স.) এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে কথিকা: আব্দুল্লাহ আল মারুফ
ঙ. ভক্তিমূলক নজরুল সংগীত: মোহাম্মদ নাম যত জপি: খালিদ হোসেন
গ্রন্থনা: তাপসী মুনির
উপস্থাপনা: মো. শাহিনুর রহমান ও রওনক জাহান
পাণ্ডুলিপি পাঠে: এস এম উপমা শিরিন ও মোঃ শহিদুল্লাহ
প্রযোজনা: মো. দুলাল হোসাইন

৯-০৫ নূরের আলো আসলো ধরায়: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
ক. নাত-ই-রসুল: তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে: আদিবা হাসান জারা
খ. অমর জীবন: মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবন ও কর্ম নিয়ে আসরভিত্তিক আলোচনা

পরিচালনায়: কাজী সাকেরা বানু
গ. ভক্তিমূলক গান: আকাশ বাতাস দরুদ পড়ে: সমবেত কণ্ঠে
ঘ. কবিতা: খেয়াপারের তরণী: নাবিদ রহমান
ঙ. ভক্তিমূলক নজরুল সংগীত: ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ: সামিহা ইসলাম
গ্রন্থনা: শফিকুল ইসলাম বাহার
উপস্থাপনা: সুমায়তা আজিজ রিমঝিম ও রেজওয়ানা হাসান
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

১০-৩০ মরুর বুকে জান্নাতি ফুল: বিশেষ গীতিনকশা
গবেষণা, গ্রন্থনা ও গীত রচনা: আয়েত হোসেন উজ্জ্বল
সুর সংযোজন ও সংগীত পরিচালনা: লোকমান হাকিম
প্রযোজনা: রাকিবা কবির ও মোঃ মনিরুজ্জামান

বেলা

১১-০৫ প্রজন্মকণ্ঠ: নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
ক. ইদ-ই-মিলাদুন্নবির তাৎপর্য: মোঃ আরিফুল হক
খ. তথ্যের সন্ধানে: পবিত্র ইদ-ই-মিলাদুন্নবি (স.) উদযাপন নিয়ে খবরাখবর: শেখ আহমেদ মোস্তফা শাওন
গ. বৈঠকি: মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনী ও তরুণদের জন্য শিক্ষা
সঞ্চালনা: মোঃ ইসহাক আলী
ঘ. দিবসভিত্তিক গান
গ্রন্থনা: আয়েশা সিদ্দিকা মনি
উপস্থাপনা: আয়েশা সিদ্দিকা মনি ও তাসনিম হোসাইন
প্রযোজনা: ড. সায়লা আকতার

২-৩০ বুলবুলে মদিনা: বিশেষ গীতিনকশা
গীতরচনা ও গ্রন্থনা: রঙ্গু শাহাবুদ্দিন
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: সৈয়দ জামান
প্রযোজনা: মকবুল হোসাইন

বিকাল

৫-১০ পবিত্র ইদ-ই-মিলাদুন্নবি (স.) উপলক্ষ্যে বিশেষ দোয়া মাহফিল
পরিচালনা: মাওলানা ড. মোঃ কাফিল উদ্দিন সরকার
প্রযোজনা: মোঃ দুলাল হোসাইন

রাত

৯-০০ উত্তরণ: বেতার ম্যাগাজিন
ক. প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
খ. নবিজির জন্ম নিয়ে কবিতা: ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম (আর্বিভাব)
আবৃত্তিতে: আজহারুল ইসলাম রনি
গ. পবিত্র ইদ-ই-মিলাদুন্নবি (স.) এর ইতিহাস, গুরুত্ব ও তাৎপর্য: মাওলানা ড. মোঃ আবু ছালেহ পাটোয়ারী
ঘ. ভক্তিমূলক নজরুল সংগীত
ঙ. মহানবি (স.) এর জন্মস্থান পবিত্র মক্কানগরী নিয়ে তথ্যমূলক নিবন্ধ: তরিকুল ইসলাম সৈকত
গ্রন্থনা: আমান চপল
উপস্থাপনা: জি এম তারিক ও আসফিয়া তাসনিম
পাণ্ডুলিপি পাঠ: স্নিগ্ধা সোহানা হক ও নসরুত আলী কনুজ
প্রযোজনা: নাদিয়া ফেরদৌস

৯-৪৫ সংবাদ প্রবাহ: পবিত্র ইদ-ই-মিলাদুন্নবি (স.) উপলক্ষ্যে বিশেষ সংবাদ প্রবাহ
গ্রন্থনা: ইমরুল হাসান চৌধুরী
ধারাবর্ণনা: শামীম আহমেদ
প্রযোজনা: মোঃ দুলাল হোসাইন

১০-০০ মরুর বুকে জান্নাতি ফুল: বিশেষ গীতিনকশা
গবেষণা, গ্রন্থনা ও গীত রচনা: আয়েত হোসেন উজ্জ্বল
সুর সংযোজন ও সংগীত পরিচালনা: লোকমান হাকিম
প্রযোজনা: রাকিবা কবির ও মোঃ মনিরুজ্জামান

ঢাকা- খ: মধ্যম তরঙ্গ ৮১৯ কিলোহার্জ (এফএম ১০২ মেগাহার্জ)

সকাল

৭-৩০ মহানগর: ঢাকা মহানগর কেন্দ্রিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
খ. ভক্তিমূলক নজরুল সংগীত: আয় মরুপারের হাওয়া নিয়ে যারে মদিনায়: খায়রুল আনাম শাকিল
গ. বিশেষ কথিকা: শান্তি ও সাম্যের দূত হযরত মুহাম্মদ (স.): মাওলানা আব্দুজ জাহের মাহমুদ
ঘ. নজরুল সংগীত: তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে: নাশিদ কামাল
ঙ. কবিতা আবৃত্তি: ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম: মীর বরকত
গ্রন্থনা: লিয়াকত আলী খান
উপস্থাপনা: খান নজম-ই-এলাহি ও ইশরাত জাহান নিলা
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

সন্ধ্যা

৭-৩০ নূরের আলো আসলো ধরায়: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
ক. নাত-ই-রসুল: তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে: আদিবা হাসান জারা
খ. অমর জীবন: মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবন ও কর্ম নিয়ে আসরভিত্তিক আলোচনা
পরিচালনায়: কাজী সাকেরা বানু
গ. ভক্তিমূলক গান: আকাশ বাতাস দরুদ পড়ে: সমবেত কণ্ঠে
ঘ. কবিতা: খেয়াপারের তরণী: নাবিদ রহমান
ঙ. ভক্তিমূলক নজরুল সংগীত: ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ: সামিহা ইসলাম
গ্রন্থনা: শফিকুল ইসলাম বাহার
উপস্থাপনা: সুমায়তা আজিজ রিমঝিম ও রেজওয়ানা হাসান
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

রাত

৮-৩০ মরুর বুকে জান্নাতি ফুল: বিশেষ গীতিনকশা
গবেষণা, গ্রন্থনা ও গীত রচনা: আয়েত হোসেন উজ্জ্বল
সুর সংযোজন ও সংগীত পরিচালনা: লোকমান হাকিম
প্রযোজনা: রাকিবা কবির ও মোঃ মনিরুজ্জামান

৯-০০ প্রজন্মকণ্ঠ: নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
ক. ইদ-ই-মিলাদুন্নবির তাৎপর্য: মোঃ আরিফুল হক
খ. তথ্যের সন্ধানে: পবিত্র ইদ-ই-মিলাদুন্নবি (স.) উদযাপন নিয়ে খবরাখবর: শেখ আহমেদ মোস্তফা শাওন
গ. বৈঠকি: মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনী ও তরুণদের জন্য শিক্ষা
সঞ্চালনা: মোঃ ইসহাক আলী
ঘ. দিবসভিত্তিক গান
গ্রন্থনা: আয়েশা সিদ্দিকা মনি
উপস্থাপনা: আয়েশা সিদ্দিকা মনি ও তাসনিম হোসাইন
প্রযোজনা: ড. সায়লা আকতার

বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম

বেলা

২-৩০ মরুভাস্বর: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: ড: আহমেদ মাওলা
সুর সংযোজন ও সংগীত পরিচালনা:
আবদুল ইয়া ওয়াদুদ সরকার
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

৩-৩০ মাহে রবিউল আওয়াল: বিশেষ আলোচনা ও মিলাদ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: দেলোয়ার হোসেন আনসারী
ক. পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও তরজমা:
ক্বারি ইলিয়াছ ফারুকী
খ. প্রিয়নবি রসুল (স.) এর জীবনী নিয়ে আলোচনা
গ. হামদ ও নাত
ঘ. মিলাদ পরিচালনা: উপস্থাপক
প্রযোজনা: ড. মোঃ সাঈদুর রহমান

বিকাল

৫-১০ আলোর দিশারি: শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা: কামরুন্নাহার
শিশু-উপস্থাপক: লুবাবা ইলমিয়াতল
ক. আমাদের মহানবি (স.) নিয়ে শিশুতোষ আলোচনা:
আয়েশা হক শিমু
খ. নাত-ই-রসুল (স.): মাইসা ফারিয়া
গ. মিলাদুন্নবির শিক্ষা ও তাৎপর্য: মেহবুব-ই-ইনতেখাব
ঘ. ইদ-ই-মিলাদুন্নবি নিয়ে কবিতা: তাহিয়া যারীন
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

রাত

৯-১০ বিশেষ বেতার বিবরণী: পবিত্র ইদ-ই-মিলাদুন্নবি (স.)
উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের
উপর ভিত্তি করে বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জামিল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী
প্রযোজনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী

বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

সকাল

৬-৩০ সত্যরূপে এলেন রসুল: গীতিনকশা
রচনা: এস এম আব্দুর রউফ
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: আব্দুস সালাম
ধারাবর্ণনা: সুমাইয়া আনোয়ার পূর্ণা
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

৯-০৫ আল আমিন: শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ড. শিরিন আখতার
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা: উপস্থাপক
খ. হামদ: ফাতেমা আবেদীন জান্নাত
গ. কবিতা আবৃত্তি (দিবসভিত্তিক): নাজিয়াত নেওয়াজ
ঘ. ভক্তিমূলক নজরুল সংগীত: হুমায়রা জান্নাত মীম
ঙ. হযরত মুহাম্মদ (স.) এর ছোটবেলার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য
ঘটনা গল্পাকারে আলোচনা: ড. মোহাঃ আশরাফ উজ জামান
চ. নাত-ই-রসুল (স.): মোঃ সাদিব ইয়ামিন দিব্য
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস

দুপুর

১২-১৫ ইসলামের ঐ সওদা লয়ে: গীতিনকশা
রচনা: জামাল দ্বীন সুমন
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: মোঃ শাহেদুজ্জামান খান
চপল
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

বিকাল

৫-১০ পবিত্র ইদ-ই মিলাদুন্নবি উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান ও মিলাদ
মাহফিল
সঞ্চালনা: ক্বারি মোঃ মনোয়ার হোসেন
অংশগ্রহণ: ড. মোঃ কাউসার হোসাইন
প্রযোজনা: এস এম নাদিম সুলতান

বাংলাদেশ বেতার, রংপুর

বেলা

৩-৩০ সাহিত্য বিচিত্রা: সাহিত্য বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা: ড. নাসিমা আক্তার
দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক আলোচনা: পরিচালক
ক. মনীষীর জীবন ও কর্ম: নবি হযরত মুহাম্মদ (স.): মুনিরা শাহনাজ চৌধুরী কেয়া
খ. বাংলা সাহিত্য জগতে ইসলাম নিয়ে গ্রন্থ: অধ্যাপক আতাহার আলী খান
গ. মরুর দুলাল: মোঃ রাকিবুল ইসলাম
ঘ. কবিতা আবৃত্তি
প্রযোজনা: মোছা. ফারহানা আর্জুমান বানু

বিকাল

৫-১০ পবিত্র ইদ-ই মিলাদুন্নবি (স.) উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা ও দোয়া মাহফিল
পরিচালনা: মাওলানা বায়েজিদ হোসাইন
ক. প্রাসঙ্গিক আলোচনা: পরিচালক
খ. তেলাওয়াত ও তরজমা: হাফেজ ক্বারি মাওলানা মোঃ মোকতার হোসেন
গ. পবিত্র ইদ-ই-মিলাদুন্নবির গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা ও দোয়া: মাওলানা মোঃ ইদ্রিস আলী
ঘ. রসুল (স.) এর জীবন ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা: মাওলানা রকিব উদ্দিন আহাম্মেদ
প্রযোজনা: মোছা. ফারহানা আর্জুমান বানু

রাত

৯-১০ পবিত্র ইদ-ই-মিলাদুন্নবি উপলক্ষ্যে রংপুর অঞ্চলে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মোঃ সিরাজুল ইসলাম
প্রযোজনা: মৃন্ময় মণ্ডল তুষার

বাংলাদেশ বেতার, সিলেট

সকাল

৬-৩০ নবি মোর পরশমণি: হামদ/নাত নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: শামসুল আলম সেলিম
উপস্থাপনা: মুন্নি আক্তার ও আবু বক্কর আল আমিন
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৮-৩০ বিচিত্রা: প্রভাতি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গ কথা: পবিত্র ইদ-ই-মিলাদুন্নবি (স.)
খ. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (স.) এর অবদান: মাওলানা আশরাফুল করিম
গ. নাত-ই-রসুল: ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ
ঘ. হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবন ও আদর্শ অনুসরণ: মাওলানা মোজাম্মিল হোসাইন
গ্রন্থনা: এম এ হোসেন
উপস্থাপনা: রাবেয়া বেগম ও রিফাত আরা
প্রযোজনা: মোঃ দেলওয়ার হোসেন

৯-২০ মরু সাহারা আজি মাতোয়ারা: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনী নিয়ে আলোচনা: মাওলানা শাহ নজরুল ইসলাম
খ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি: সাদিয়া ফারজানা
গ. হৃদয়ে নবি: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: আব্দুস সবুর মাখন
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: মোঃ ওয়াসিম
ধারাবর্ণনা: নুজাইফা হানিফ
গ্রন্থনা: আনোয়ারা বেগম
উপস্থাপনা: আরিশা চৌধুরী নোছাইবা
প্রযোজনা: মোঃ দেলওয়ার হোসেন

দুপুর

১২-১৫ আজকের সংবাদপত্র: পবিত্র ইদ-ই-মিলাদুন্নবি (স.) উপলক্ষ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সংবাদ শিরোনাম ও সম্পাদকীয় মতামতের উপর পর্যালোচনামূলক অনুষ্ঠান
পর্যালোচনা: মুহিত চৌধুরী
উপস্থাপনা: আল আজাদ
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

বেলা

২-০৫ মদিনার বুলবুল: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
পরিচালনা: মোকাদ্দেস বাবুল
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৩-১০ রসুল আমার নূরের নবি: ভক্তিমূলক গানের বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: সদরুজ্জামান চৌধুরী
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: মোঃ কুতুব উদ্দিন
উপস্থাপনা: রিফাত আরা
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

বিকাল

৪-০৫ ইয়া নবি সালামু আলাইকা: দোয়া মাহফিল
দোয়া পরিচালনা: মাওলানা মোঃ শাহ আলম
অনুষ্ঠান পরিচালনা: মাওলানা মতিউর রহমান
প্রযোজনা: সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম

৪-৩৫ সাহারাতে ফুটলরে ফুল: ভক্তিমূলক পল্লিগীতির গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জান্নাতুল নাজনীন আশা
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৫-১০ হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনাদর্শ ও শিক্ষা: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: প্রফেসর মাহমুদুল হাসান, প্রফেসর জেবা আমাতুন হান্না ও মাওলানা শাহ নজরুল ইসলাম
সঞ্চালনা: নাজমা পারভীন
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

বাংলাদেশ বেতার বরিশাল

সকাল

১০-০৫ ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ: শিশু-কিশোরদের জন্য আলেখ্যানুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: পাপিয়া জেসমিন
ক. সত্য ও ন্যায়ের পথপ্রদর্শক মহানবি (স.): মোহাম্মদ আবদুল জব্বার
খ. নাতে রাসূল (সা:)
গ. কবিতা আবৃত্তি (নবিজির উপর রচিত): মালিহা জান্নাত ও শাহরিয়ার নাফিজ
ঘ. নজরুল সংগীত (নবিজীর উপর রচিত): সাইয়ারা সায়ান ও আনতারা আনিশা
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

বেলা

৩-০৫ বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারি মহানবি (স.)
আলোচনা অনুষ্ঠান পরিচালনা: মাওলানা ড. আবুবকর ছিদ্দিক
অংশগ্রহণ: মাওলানা আবদুল হাকিম মাদানী, আবু জাফর মোঃ হাবিবুর রহমান ও মুহা: জাকির হোসাইন
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

৩-৩০ মরুর বুকে নূরের নবি: গীতিনকশা
রচনা: শেখ কামরুন নাহার কাদির
সুর ও সংগীত পরিচালনা: মীর সাব্বির হোসেন শামীম
বর্ণনা: ইমন
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

বিকাল

৫-১৫ সাইয়্যেদুল মুরসালিন: দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠান
পরিচালনা: মাওলানা মোঃ মুনিরুজ্জামান নূরানী
ক. পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও তরজমা পাঠ: মাওলানা মোঃ শাহাদাত হোসাইন
খ. আদর্শ সমাজ গঠনে হযরত মুহাম্মদ (স.): গাজী মোঃ আমিনুল ইসলাম
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও

বিকাল

৪-৩৫ ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ: আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: মাওলানা মোঃ মকিম উদ্দিন
অংশগ্রহণ: মাওলানা মোঃ মতিউর রহমান, মাওলানা মোঃ মীম খিজির আহমদ
প্রযোজনা: দেওয়ান আবুল বাশার

৫-১০ বিশ্বমানবতার দূত: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: আনোয়ারুল ইসলাম
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: মো. নুরুল ইসলাম দেওয়ান
প্রযোজনা: দেওয়ান আবুল বাশার

৫-৪০ পবিত্র ইদ-ই-মিলাদুন্নবি (স.) উপলক্ষ্যে বিশেষ মিলাদ মাহফিল
পরিচালনা: মাওলানা মোঃ নুরে আলম
প্রযোজনা: দেওয়ান আবুল বাশার

বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার

সকাল

৯-৩০ পথের দিশারি: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আবতাহী মো. আল জাওয়াদ
ক. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি: সাদিয়া রহমান ইবনাত
খ. নাতে রসুল (স.)
গ. শিশুদের প্রতি মহানবির ভালোবাসা:
মাওলানা মো. জসিম উদ্দিন
ঘ. ভক্তিমূলক গান: রবিউল হাসান
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

১০-০৫ নবি মোর পরশমণি: ভক্তিমূলক গানের অনুষ্ঠান

১০-৩০ আলোর বর্তিকা: যুবকদের অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নুর জাহান
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা: উপস্থাপক
খ. ইদ-ই-মিলাদুন্নবি (স.) উপলক্ষ্যে যুবসমাজের ভাবনা:
মাওলানা মো. আরিফ উল্লাহ
গ. হামদ
ঘ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি: সানজিদা খান সায়মা
ঙ. ভক্তিমূলক নজরুল সংগীত
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

বেলা

১১-০৫ প্রিয় নবি হযরত: মহানবি (স.) কে নিয়ে
লেখা কবিতা, প্রবন্ধ, গান, উদ্ধৃতি নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সিরাজুল হক সিরাজ
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

১-৩৫ মরুর বুকে উঠল ফুটে: কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সিরাজুল হক সিরাজ
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

২-৩০ জেরিন হরফে লেখা: ইসলামি সংগীতের অনুষ্ঠান
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

৩-০৫ শোনাতে এলেন সত্যের বাণী: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: মোঃ ওবায়দুল্লাহ
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: বশিরুল ইসলাম
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

৩-৩৫ ইদ-ই-মিলাদুন্নবি (স.) উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা, মাহফিল ও দোয়া
পরিচালনা: মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ
অংশগ্রহণ: ড. নুরুল আবছার, মাওলানা মোঃ সিরাজুল ইসলাম সিদ্দিকী ও মাওলানা সালাহ উদ্দিন মোঃ তারেক
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

বাংলাদেশ বেতার, রাঙামাটি

সকাল

৬-৩০ নবি মোর পরশমণি: হামদ ও নাত সমন্বিত গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মোঃ মনির আহম্মেদ
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

৮-১০ রহমতের দূত কামলিওয়ালা: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: হাসান মাহমুদ মঞ্জু
সুর ও সংগীত পরিচালনা: পাপিয়া আহম্মেদ
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

৮-৪০ মহানবির শুভাগমন: স্বরচিত গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মোঃ মহিউদ্দিন

৯-২০ রাহমাতুল্লিল আল আমিন: বিশেষ আলোচনা মিলাদ ও দোয়া মাহফিল
ক. পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও তরজমা: ক্বারি হাফেজ মোঃ আবুল কাশেম
খ. মানবতার মুক্তির দূত মহানবি (স.): প্রফেসর এনামুল হক খন্দকার
গ. হামদ
ঘ. পবিত্র ইদ-ই মিলাদুন্নবি (স.) এর শিক্ষা এবং এ দিবসে করণীয়: মোঃ আশরাফুজ্জামান
ঙ. নাত ই রসুল
চ. দরুদ, ক্বিয়াম ও সালাম
গবেষণা, গ্রন্থনা ও পরিচালনা: মাও: মোঃ শরিফুল ইসলাম
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

বেলা

২-৩৫ ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. পবিত্র ইদ-ই মিলাদুন্নবি (স.) এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য: তাছাদ্দিক হোসেন কবির
খ. মিলাদুন্নবির কবিতা আবৃত্তি: আরুশা তাসনিম
গ. মিলাদুন্নবির দ্বৈতকণ্ঠে গান
ঘ. মিলাদুন্নবির শিক্ষা: শিশুতোষ কথিকা: হাছিনা বেগম
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মুক্তা আক্তার
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

সকাল

৭-৩০ শান্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (স.): বিশেষ ইসলামি গান
রচনা: মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: মোঃ আব্দুর রহিম
ধারাবর্ণনা: হোসনে আরা শিরিন ও মাহমুদুল হাসান
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

৮-৪০ পরশমণি রসুল (স.): শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
কবিতা, নাত-ই-রসুল, আবৃত্তি ও বিশ্বনবী গ্রন্থ থেকে পাঠ সমন্বয়ে দলীয় পরিবেশনা
অংশগ্রহণ: ওয়াহিদুল আলম স্মৃতি একাডেমি
প্রযোজনা: এ বি এম রফিকুল ইসলাম

৯-১৫ তোমার প্রেমে হৃদয় দোলে: কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
প্রযোজনা: এ বি এম রফিকুল ইসলাম

৯-৩০ অপরূপা বান্দরবান: বেতার ম্যাগাজিন
ক. পবিত্র ইদ-ই-মিলাদুন্নবি উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা: উপস্থাপক
খ. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আদর্শের অনুসরণ: মাওলানা মোঃ মোবাশ্বেরুল হক
গ. হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবন ও কর্ম নিয়ে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি: মোহাম্মদ ইয়াকুব
ঘ. কর্ম ও জীবন চর্চা: শুদ্ধাচার, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ নিয়ে সংকলিত নিবন্ধ: জনাব এহসানুল করিম
ঙ. তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে: ভক্তিমূলক গান
গ্রন্থনা: আমিনুর রহমান প্রামাণিক
উপস্থাপনা: হোসনে আরা খানম ও হারুন অর রশিদ
প্রযোজনা: এ বি এম রফিকুল ইসলাম

বেলা

২-০৫ তুমি তো শাহে মদিনা: ভক্তিমূলক গানের অনুষ্ঠান

২-৪০ ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ: গ্রন্থনাবদ্ধ নাত-ই-রসুল
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মোহাম্মদ ইয়াকুব
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

৩-২০ হাবিবে খোদা মুহাম্মদ (স.): বিশেষ আলোচনা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল
ক. মহানবি (সা.) এর জীবনকর্ম ও আদর্শ: মাওলানা মোঃ ওসমান গণি ও মাওলানা মো: এহসানুল হক আল মঈন
খ. কাসিদা পাঠ ও মিলাদ
পরিচালনা: মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
প্রযোজনা: এ বি এম রফিকুল ইসলাম

বিকাল

৪-১০ নবি-জীবনী: কবি গোলাম মোস্তফা রচিত: বিশ্বনবী ও বিশ্বনবীকে নিয়ে লেখা অন্যান্য গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতির গ্রন্থনাবদ্ধ পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মোঃ শওকত আযম
পাঠ: তাহিয়া রহমান ও নিব্বানুল কবির বাপ্পী
প্রযোজনা: এ বি এম রফিকুল ইসলাম

৪-৪৫ ইয়ানবি সালামুআলাইকা: বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন মসজিদে আয়োজিত মিলাদুন্নবি উপলক্ষ্যে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে বিশেষ বেতার বিবরণী
বহি:ধারণ, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মোঃ মোবারক হোসেন
প্রযোজনা: এ বি এম রফিকুল ইসলাম

বাংলাদেশ বেতার কুমিল্লা

সকাল

৮-১০ মুহাম্মদের নাম: নাত-ই-রসুল এর গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: খায়রুল বাশার বাঁধন
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদি হাছান

৯-০৫ মহানবির জীবনাদর্শ: বিশেষ আলোচনা ও দোয়া মাহফিল
পরিচালনা: মাওলানা হাবিবুর রহমান আল ফরিদী
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

বিকাল

৩-০৫ মরুর বুকে রহমতের বৃষ্টি: বিশেষ নাটক
রচনা: মোঃ আশরাফ হোসেন
প্রযোজনা: সৈয়দ মোঃ বিলাল উদ্দিন

৩-৩০ সত্যের জ্যোতি এল দুনিয়ায়: বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সুলতানা পারভীন দিপালী
ক. সত্যপথের দিশারি হযরত মুহাম্মদ (স.): প্রফেসর সেলিনা রহমান
খ. নাত-ই-রসুল: সালমা নূর কেয়া
গ. মহানবি (স.)-কে নিবেদিত কবিতা আবৃত্তি: সোহানা শারমিন রাকা
ঘ. ভক্তিমূলক নজরুল সংগীত: বাবুল কৃষ্ণ বিশ্বাস
ঙ. বিশ্বনবি গ্রন্থ থেকে পাঠ: সাদিয়া শারমিন
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদি হাছান

৪-৩৫ মরু সাহারায় আজি: বিশেষ গীতিনকশা
গীত রচনা: আহমেদ উল্লাহ
সুর: এম এ কাইয়ুম খান
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদী হাছান

৫-১০ নারীর মর্যাদায় মহানবির শিক্ষা: নারীদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: সাজিয়া ইয়াসমিন, উপস্থাপনা: নাজমুন নাহার পূর্ণি
ক. নারীর ক্ষমতায়নে মহানবির শিক্ষা: নাসিমা আক্তার
খ. ইসলামি নজরুল সংগীত
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদী হাছান

৫-৩৫ হে নবি হে রসুল (স.): নাত-ই-রসুল এর গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মোঃ আল আমিন
উপস্থাপনা: বিক্রম চন্দ্র দেবনাথ
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদি হাছান

সন্ধ্যা

৬-১০ পরশমণি: বিশেষ গীতি আলেখ্য
গ্রন্থনা: কাজী খোরশেদ আলম
উপস্থাপনা: সুমন চক্রবর্তী ও চৈতী দেবনাথ বৃষ্টি
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদি হাছান

বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ

সকাল

৮-৩৫ নবি মোর পরশমণি: নাত-ই-রসুল নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: খন্দকার সাবিনা ইয়াসমিন
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

১০-০৫ আলোর দিশারি: বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মাওলানা মোঃ রুহুল আমিন
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা: উপস্থাপক
খ. মহনবি (স:) এর মিরাজ: মুফতি আব্দুল্লাহ আল মামুন
গ. নাত-ই-রসুল (স:)
ঘ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি: ইনজামামুল হক
ঙ. নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবি (স:): হাফেজ মাওলানা মুফতি ওয়ালিউল্লাহ
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

বেলা

২-৩০ সে যে আমার কামলিওয়ালা: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: সাঈদুর রহমান সাঈদ
ধারাবর্ণনা: লুবনা হাসনা ফারুক মিষ্টি ও আল মাঝি
সুর ও সংগীত সংযোজনা: শেখ আলী আহমেদ

৩-০৫ বিশ্বশান্তির দূত মহানবি (স.): বিশেষ আলোচনা ও দোয়া মাহফিল
ক. আলোচনা সঞ্চালনা: মাওলানা রহুল আমীন
অংশগ্রহণ: আবু অবায়দা মোহাম্মদ মাস-উ-দুল হক, ড. আবু সাঈদ মো: আবদুল্লাহ ও রাজিউদ্দিন খান রাজু
খ. কিয়াম ও দোয়া পরিচালনা: ড. আবু সাঈদ মোঃ আবদুল্লাহ
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

বিকাল

৪-৪৫ ওগো প্রিয়নবি: বিশেষ কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: এস এম শফিউল্লাহ রাজ
প্রযোজনা: ফয়সাল মাহমুদ

৫-৪০ ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ: ভক্তিমূলক গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সিফাত বিনতে জামান রাকা
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ

সকাল

৮-২০ পূর্বাশা: প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গকথা
খ. কথিকা: বিশ্বশান্তির অগ্রদূত হযরত মুহাম্মদ (স.): মোঃ রাহাত বিল্লাল লস্কর
গ. নাত-ই রসুল: নবি মোর পরশমণি
ঘ. নজরুল সংগীত: আমি যদি আরব হতাম: ইয়াকুব আলী খান
গ্রন্থনা: শাহানা বেগম
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম

৯-৪০ ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ: ভক্তিমূলক নজরুল সংগীতের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আঁখি আকবর রনি
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম

১০-১০ মদিনার বুলবুলি: ভক্তিমূলক লোকগীতি

১০-৩০ পরশমণি: ভক্তিমূলক গানের অনুষ্ঠান

বিকাল

৫-১০ রাহমাতুল্লিল আলামিন: মিলাদ মাহফিল
পরিচালনা: মোঃ মোফাজ্জল হোসেন সরদার
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম

৫-২৫ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনাদর্শ অনুসরণ বিষয়ে কথিকা
অংশগ্রহণ: সালমা খাতুন
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম
প্রযোজনা: এ বি এম রফিকুল ইসলাম

জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল

সকাল

৭-২০ সুখের ঠিকানা:
পবিত্র ইদ-এ মিলাদুন্নবি উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
প্রযোজনা: সাহিদা মঞ্জুরী

বেলা

১১-৩০ স্বাস্থ্যই সুখের মূল
ক. পবিত্র ইদ-ই মিলাদুন্নবি উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. ভক্তিমূলক নজরুল সংগীত: ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ: খালেদ হোসেন
গ্রন্থনা: শাহনাজ পারভীন
উপস্থাপনা: শাহাবুদ্দিন মাহতাব ও শাহনাজ পারভীন
প্রযোজনা: মোহাম্মদ ইফফাতুর রহমান

বিকাল

৪-০৫ এসো গড়ি ছোট পরিবার
ক. পবিত্র ইদ-ই মিলাদুন্নবি উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. নাত-ই-রসুল: নবি দিনের রসুল: রওশন আরা মাসুদ
গ্রন্থনা: আমিনুল ইসলাম মঞ্জু
উপস্থাপনা: লায়লা আরিয়ানী হোসেন ও আমিনুল ইসলাম মঞ্জু
প্রযোজনা: তোফাজ্জল হোসেন

রাত

৮-১০ সুখী সংসার
ক. পবিত্র ইদ-ই-মিলাদুন্নবি উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. ভক্তিমূলক নজরুল সংগীত: তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে: খালিদ হোসেন
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সুরাইয়া সুলতানা মনির
প্রযোজনা: সাহিদা মঞ্জুরী

কৃষি সার্ভিস দপ্তর

সকাল

৭-৫০ কৃষি সমাচার: কৃষি ও পরিবেশভিত্তিক অনুষ্ঠান
পবিত্র ইদ-ই-মিলাদুন্নবি উপলক্ষ্যে গঠনমূলক আলোচনা
ভক্তিমূলক গান: ধ্যানের নবি খোদার হাবিব
শিল্পী: লায়লা আঞ্জুমান্দ বানু
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ফয়সাল আহমেদ অনন্ত
প্রযোজনা: নুসরাত হারুন

সন্ধ্যা

৬-০৫ সোনালি ফসল: আঞ্চলিক অনুষ্ঠান
পবিত্র ইদ-ই-মিলাদুন্নবি উপলক্ষ্যে গঠনমূলক আলোচনা
ক. পবিত্র ইদ-ই-মিলাদুন্নবির গুরুত্ব ও তাৎপর্য: মিজানুর রহমান রায়হান
খ. ভক্তিমূলক গান: মদিনারই ফুল বাগিচার: আব্দুল আলীম
আসর পরিচালনা: আলহাজ্জ ফারুক আহমেদ
প্রযোজনা: নুসরাত হারুন

৭-০৫ দেশ আমার মাটি আমার: জাতীয় অনুষ্ঠান
পবিত্র ইদ-ই-মিলাদুন্নবি উপলক্ষ্যে গঠনমূলক আলোচনা
ক. পবিত্র ইদ-ই মিলাদুন্নবির গুরুত্ব ও তাৎপর্য: অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল মারুফ
খ. গান: তাওহিদেরই মুর্শিদ মোহাম্মদই নাম: ফেরদৌস আরা
আসর পরিচালনা: আব্দুস সবুর খান চৌধুরী
প্রযোজনা: রনিয়া সুলতানা

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

বেলা

১১-৩০ মরুর ধূলি উঠল রেঙে: বিশেষ গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
ক. মহানবি (স.) এঁর পৃথিবীতে আগমনের পূর্বসংকেত এবং মহানবি (স.) এঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী নিয়ে আলোকপাত
খ. না'তে রসুল পরিবেশন
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: প্রফেসর মোঃ আব্দুল কাদির
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম

সকাল

১০-০৫ নবি মোর পরশমণি: গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আমিনুল ইসলাম মঞ্জু
প্রযোজনা: উম্মে ফারহানা হোসেন শিমু

বহির্বিশ্ব কার্যক্রম

বাংলা সার্ভিস

রাত

১০:৩০ (মধ্যপ্রাচ্য)
১:১৫ (ইউরোপ)
পবিত্র ইদ-ই-মিলাদুন্নবি উপলক্ষ্যে বিশেষ দোয়া মাহফিল
ক. কুরআন তেলাওয়াত: ক্বারি মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ
খ. আলোচনা: মাওলানা কাউসার জামিল
গ. মিলাদ পরিচালনা: মাওলানা সোহেল মুহাদ্দিস
প্রযোজনা: উম্মে রুম্মান

English, Arabic, Hindi, Nepali Service

Special Talk on the Occasion of Eid-E-Miladunnabi
Written By: Dr. Syed Abdullah Al Maruf
Translate & Read By: Scheduled Artist Of Arabic, Hindi, Nepali Service.

বাংলাদেশ বেতারের জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদ

প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার কেন্দ্র	সম্প্রচার/রিলে
বাংলা			
সকাল ৭-০০	২০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সকাল ৯-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	ঐ
সকাল ১০-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সকাল ১১-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	ঠাকুরগাঁও, বরিশাল, কক্সবাজার, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
দুপুর ১২-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বেলা ২-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বেলা ৩-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, ঠাকুরগাঁও, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বিকাল ৪-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সন্ধ্যা ৬-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ,ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
রাত ৮-৩০	২০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
রাত ১১-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল
রাত ১২-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	
ইংরেজি			
সকাল ৮-০০	১০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বেলা ১-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, রংপুর, সিলেট, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বিকাল ৫-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
রাত ৯-৩০	১০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা
রাত ১২-০৫	৫ মিঃ	ঢাকা	

স্থানীয়/ আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা প্রচারিত সংবাদ

ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	আঞ্চলিক বার্তাসংস্থা
বাংলা	সকাল ৮-১০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও
বাংলা	সকাল ৯-০৫	৫ মিঃ	ময়মনসিংহ
বাংলা	সকাল ১০-০০	৫ মিঃ	খুলনা
বাংলা	সকাল ১০-০৫	৫ মিঃ	ময়মনসিংহ
বাংলা	সকাল ১১-০৫	৫ মিঃ	ঠাকুরগাঁও
বাংলা	দুপুর ১২-১০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, বান্দরবান
বাংলা	দুপুর ১২-২৫	৫ মিঃ	কক্সবাজার
চাকমা	বেলা ১-০৫	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম
বাংলা	বেলা ১-০৫	৫ মিঃ	সিলেট
বাংলা	বেলা ১-০৫	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি
মারমা	বেলা ১-১০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম
ত্রিপুরা	বেলা ১-১৫	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম
বাংলা	বেলা ২-০৫	৫ মিঃ	রাজশাহী, রংপুর
তঞ্চঙ্গা	বেলা ২-০৫	৫মিঃ	বান্দরবান
ত্রিপুরা	বেলা ২-০৫	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি
ত্রিপুরা	বেলা ২-১০	৫ মিঃ	বান্দরবান
চাকমা	বেলা ২-১৫	৫ মিঃ	বান্দরবান
বাংলা	বেলা ২-২০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম
মারমা	বেলা ৩-০৫	৫ মিঃ	বান্দরবান
বাংলা	বিকাল ৪-০৫	৫ মিঃ	রাজশাহী, খুলনা, বান্দরবান
চাকমা	বিকাল ৪-১৫	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি
মারমা	বিকাল ৪-২০	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি
তঞ্চঙ্গা	বিকাল ৪-২৫	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি

স্থানীয়/ আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা প্রচারিত সংবাদ

ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	আঞ্চলিক বার্তাসংস্থা
বাংলা	বিকাল ৫-১০	৫ মিঃ	বরিশাল
বাংলা	বিকাল ৫-৩০	৫ মিঃ	কুমিল্লা
ইংরেজি	সন্ধ্যা ৬-০৫	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম, খুলনা
বাংলা	সন্ধ্যা ৬-০৫	৫ মিঃ	ঠাকুরগাঁও
বাংলা	সন্ধ্যা ৭-০০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, কক্সবাজার
বাংলা	রাত ৮-০০	৫ মিঃ	ঠাকুরগাঁও

বিশেষ সংবাদ

প্রকৃতি	ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার কেন্দ্র	সম্প্রচার/রিলে
বাণিজ্যিক সংবাদ	বাংলা	বিকাল ৫-০৫ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ
খেলাধুলার সংবাদ	বাংলা	রাত ৮-০৫ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সার্ক সংবাদ (সোমবার)	বাংলা	সন্ধ্যা ৬-৩৫ মিঃ	৭.৫ মিঃ	ঢাকা	
	ইংরেজি	সন্ধ্যা ৬-৪৩ মিঃ	৭.৫ মিঃ	ঢাকা	
মনিটরিং সংবাদ (মঙ্গলবার)	বাংলা	রাত ১০-০০ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	
মনিটরিং সংবাদ (বুধবার)	ইংরেজি	রাত ১০-০০ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	

সংবাদ পরিক্রমা

ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার দিন	প্রচার কেন্দ্র, সম্প্রচার/রিলে
বাংলা	সকাল ১১-০৫	১০ মিঃ	প্রতি শুক্রবার	ঢাকা
ইংরেজি	রাত ৯-৪৫	১০ মিঃ	প্রতি বৃহস্পতিবার	ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

- বর্ষায় (এপ্রিল-অক্টোবর) ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বাড়ে। এসময় অধিক সতর্ক থাকুন।
- ডেঙ্গু জ্বরের বাহক এডিস মশা পরিষ্কার পানিতে বংশ বিস্তার করে।
- অফিস, ঘর ও আশেপাশে পানি জমতে দেবেন না। যেকোন পাত্রে জমিয়ে রাখা / জমা থাকা পানি ৩ দিনের মধ্যে পরিবর্তন করুন।
- এডিস মশা সাধারণত দিনের বেলা কামড়ায়। যথাসম্ভব লম্বা পোশাক পরুন। দিনে ঘুমানোর ক্ষেত্রে মশারি ব্যবহার করুন।

ডেঙ্গু প্রতিকারে করণীয়

- তীব্র জ্বর, মাথাব্যথা ও মাংসপেশীতে ব্যথা, শরীরে লালচে দানা ইত্যাদি ডেঙ্গু রোগের লক্ষণ হলেও সাম্প্রতিককালে এর ব্যতিক্রম পাওয়া যাচ্ছে।
- জ্বরে প্যারাসিটামল ব্যতীত অন্য ব্যথানাশক ঔষধ খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। রোগীকে বেশি বেশি তরল খাবার খাওয়ান।
- জ্বর হলে নিকটস্থ হাসপাতালে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন এবং ডেঙ্গু জ্বরের পরীক্ষা করুন।
- জ্বর ভালো হওয়ার পরও ডেঙ্গুজনিত মারাত্মক জটিলতা দেখা দিতে পারে। তাই সতর্ক থাকুন ও হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করুন।

বাংলাদেশ বেতারের দৈনিক অনুষ্ঠানের সময়সূচি

কেন্দ্র/ইউনিট	ট্রান্সমিটার		প্রচার সময়	স্থিতি (ঘণ্টা)	মন্তব্য
ঢাকা	ঢাকা-ক: ৬৯৩ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১২:১০	৬:১০	
			১৪:১৫ - ২৩:১৫	৯:০০	
	ঢাকা-খ: ৮১৯ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১২:১০	৬:১০	
			১৪:১৫ - ২৩:১০	৮:৫৫	
			০০:০০ - ৩:০০	৩:০০	
	ঢাকা-গ: ১১৭০ কিলোহার্জ		১৫:০০ - ১৭:০০	২:০০	
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ		০৭:০০ - ১৯:০০	১২:০০	
	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ		১৪:০০ - ২৩:০০	৯:০০	
	এফএম - ১০০ মেগাহার্জ	বিবিসি	০৬:০০ - ১২:০০	৬:০০	
		বিবিসি	১৭:০০ - ২৩:০০	৬:০০	
		নিশুতি	২৩.০০ - ৩:০০	৪:০০	
	এফএম - ১০২ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১২:১০	৬:১০	
			১৪:১৫ - ২৩:১০	৮:৫৫	
			০০:০০ - ৩:০০	৩:০০	
	এফএম - ১০৪ মেগাহার্জ	এনএইচকে	২১:০০ - ২১:২০	০০:২০	
	এফএম - ১০৬ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১২:১০	৬:১০	
			১৪:১৫ - ২৩:১৫	৯:০০	
বাণিজ্যিক কার্যক্রম	এএম - ৬৩০ কিলোহার্জ		০৯:০০ - ১৯:০০	১০:০০	
	এফএম - ১০৪ মেগাহার্জ		০৯:০০ - ১৯:০০	১০:০০	
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ		০৯:০০ - ১৯:০০	১০:০০	
ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস	এফএম - ১০০ মেগাহার্জ		১৩:০০ - ১৫:০০	২:০০	
ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৭:০০ - ২৩:০০	১৬:০০	
চট্টগ্রাম	এএম - ৮৭৩ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
	এফএম - ১০৩ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
রাজশাহী	এএম - ৮৪৬ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৬:৩০ - ১০:০০	৩:৩০	
			১৪:০০ - ১৪:৩০	০০:৩০	
			১৬:০০ - ২৩:১২	৭:১২	
	এফএম - ১০৪ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
খুলনা	এএম - ৫৫৮ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	

কেন্দ্র/ইউনিট	ট্রান্সমিটার	প্রচার সময়	স্থিতি (ঘণ্টা)	মন্তব্য
খুলনা	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ১৪:০৫	৮:০৫	যান্ত্রিক সমস্যার কারণে সম্প্রচার বন্ধ আছে
		১৪:০৫ - ১৪:৩০	০০:২৫	
		১৯:০০ - ২৩:১৫	৪:১৫	
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ	১৯:৩০ -২৩:১৫	৩:৪৫	
	এফএম - ১০২ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
		১৪:৩০ - ২৩:১৫	৮:৪৫	
	এফএম - ১০০.৮ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
		১৪:৩০ - ২৩:১৫	৮:৪৫	
রংপুর	এএম - ১০৫৩ কিলোহার্জ	০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
		১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
		১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ	১৯:৩০ - ২৩:০০	৩:৩০	
	এফএম - ১০৫.৬ মেগাহার্জ	১৪:০৫ - ১৪:৩০	০০:২৫	
		১৮:২০ - ২৩:০০	৪:৪০	
সিলেট	এএম - ৯৬৩ কিলোহার্জ	০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
		১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
		১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ	০৭:০০ - ১০:০০	৩:০০	
		১৯:০০ - ২৩:০০	৪:০০	
	এফএম - ১০৫.২ মেগাহার্জ এনএইচকে	২১:০০ - ২১:২০	০০:২০	
বরিশাল	এএম - ১২৮৭ কিলোহার্জ	০৬:০০ - ১১:১০	৫:১০	
		১৪:৫৫ - ১৫:৫৫	৮:২০	
		১৫:৫৫ - ২৩:১৫	৮:২০	
	এফএম - ১০৫.২ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ১১:১০	৫:১০	
		১৩:৫৫ - ২৩:১৫	৯:২০	
ঠাকুরগাঁও	এএম - ৯৯৯ কিলোহার্জ	০৬:৩০ - ১১:১৫	৪:৪৫	
		১৪:০০ - ২৩:১৫	৯:১৫	
	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ১১:১৫	৪:৪৫	
		১৪:০০ - ২৩:১৫	৯:১৫	
রাঙামাটি	এএম - ১১৬১ কিলোহার্জ	০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
		১৪:৫৫ - ২১:০০	৬:০৫	
	এফএম - ১০৩.২ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
		১৩:৫৫ - ২১:০০	৭:০৫	
কক্সবাজার	এএম - ১৩১৪ কিলোহার্জ	০৬:০০ - ২১:০০	১৫:০০	
	এফএম - ১০০.৮ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ২১:০০	১৫:০০	

কেন্দ্র/ইউনিট	ট্রান্সমিটার		প্রচার সময়	স্থিতি (ঘণ্টা)	মন্তব্য
কুমিল্লা	এএম - ১৪১৩ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১৪:৫৫ - ২৩:১৫	৮:২০	
	এফএম - ১০১.২ মেগাহার্জ		২১:০০ - ২১:৩০	০০:৩০	
	এফএম - ১০৩.৬ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১৩:৫৫ - ২৩:১৫	৯:২০	
বান্দরবান	এএম - ১৪৩১ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১৪:৫৫ - ২১:০০	৬:০৫	
	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১৩:৫৫ - ২১:০০	৭:০৫	
গোপালগঞ্জ	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ		০৮:০০ - ১১:০০	৩:০০	
			১৪:০০ - ২১:০০	৭:০০	
ময়মনসিংহ	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ		০৮:০০ - ১১:০০	৩:০০	
			১৪:০০ - ২১:০০	৭:০০	
বহির্বিশ্ব কার্যক্রম (শর্টওয়েভ)	ফ্রিকোয়েন্সি ৪৭৫০ কিলোহার্জ	ইংরেজি	১৮:৩০ - ১৯:০০	০০:৩০	
		নেপালি	১৯:১৫ - ১৯:৪৫	০০:৩০	
		হিন্দি	২১:১৫ - ২১:৪৫	০০:৩০	
		আরবি	২২:০০ - ২২:৩০	০০:৩০	
		বাংলা	২২:৩০ - ২৩:৩০	১:০০	
		ইংরেজি	২৩:৪৫ - ০১:০০	১:১৫	
		বাংলা	০১:১৫ - ০২:০০	০০:৪৫	

বেতার অ্যালবাম

গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ বেতার সদর দপ্তরের প্রশিক্ষণ কক্ষে তারুণ্যের শক্তি ও ছাত্র-জনতার সফল অভ্যুত্থান অনুষ্ঠান পরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়

গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ বেতার সদর দপ্তরের প্রশিক্ষণ কক্ষে তারুণ্যের শক্তি ও ছাত্র-জনতার সফল অভ্যুত্থান অনুষ্ঠান পরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ বেতার সদর দপ্তরের সম্মেলন কক্ষে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মোঃ নাহিদ ইসলাম বাংলাদেশ বেতারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন

গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ বেতার সদর দপ্তরের সম্মেলন কক্ষে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মোঃ নাহিদ ইসলাম বাংলাদেশ বেতার পরিদর্শন উপলক্ষ্যে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন

গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ বেতার সদর দপ্তরের প্রশিক্ষণ কক্ষে রাষ্ট্র সংস্কার ও বৈষম্যহীন আগামীর বাংলাদেশ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য প্রদান করেন

গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মোঃ নাহিদ ইসলাম জাতীয় বেতার ভবন আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল স্টুডিওসহ মাস্টার কন্ট্রোল রুম-এর শুভ উদ্বোধন করেন

গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মোঃ নাহিদ ইসলাম জাতীয় বেতার ভবনের ডিজিটাল স্টুডিওসহ মাস্টার কন্ট্রোল রুম পরিদর্শন করেন

গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মোঃ নাহিদ ইসলাম জাতীয় বেতার ভবনের স্টুডিওতে একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার প্রদান করেন

কাশফুল

কাশফুলের সাথে তোমার মিতালি ছিল খুব
কাঠবিড়ালি কাশফুলেরা তোমার কালো চুলেই বুঁদ
তখন থেকেই
হয়ত বা তার অনেক আগেই
আমি যখন তোমার কাজল কালো চোখের ফোয়ারাতেই
নাকের কালো তিলক ছুঁয়ে আনমনে দেই ডুব
তখন থেকেই বুকের ভেতর একটানা বুঁদবুঁদ।

রেজা কারিম
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯

চাঁদের আলো

বাতায়নের ছিদ্র দিয়ে
এল চাঁদের আলো,
সোনাঝরা আলো পড়ে
কি যে লাগে ভালো।

রূপালি চাঁদ ঐ আকাশে
করছে রূপের খেলা,
সেই খেলাতে পাগল হয়ে
বসছে চাঁদের মেলা।

পুকুর পাড়ে স্বচ্ছ জলে
আলোর ঝিকিমিকি,
আলোর খেলা জলের মাঝে
নানান কিছু শিখি।

চাঁদের বুড়ি নাটাই হাতে
দিচ্ছে বসে হাসি,
ফোকলা দাঁতের এমন হাসি
দারুণ ভালোবাসি।

সবার মুখে মিষ্টি হাসি
চাঁদের হাসি দেখে,
সেই খুশিতে এই শরতে
চাঁদটা গেছে বেঁকে।

সাঈদুর রহমান লিটন
মধুখালী, ফরিদপুর

শরৎরানি

পেঁজা তুলো মেঘের সারি
আকাশ জুড়ে ভাসে
শিউলি ফুলের সুবাস নিয়ে
শরৎরানি আসে।

ঘাসের ডগায় ভোরের শিশির
খিলখিলিয়ে হাসে
নদীর কিনার ভরা থাকে
সাদা সাদা কাশে।

বিলের ধারে শাপলা শালুক
ফোঁটে রাশি রাশি
তালের পিঠা খায় যে সবাই
মুখে নিয়ে হাসি।

এম হাবীবুল্লাহ
ঘাটাইল, টাঙ্গাইল

হে বিদ্রোহী কবি

বাবরিকাটা সেই ছেলেটি
বিদ্রোহী এক কবি,
মহাকালের কালজয়ী এক
সত্য ন্যায়ের ছবি।

লেখার মাঝে নির্ভীক তিনি
কাঁপত ব্রিটিশ বেদি,
অন্যায় রোধে চলত কলম
ছিলেন তিনি জেদি।

তোমার আলোক নহরে যে
পঙ্‌ক্তিগুলো জাগে,
জ্বালাময়ী দ্রোহের ঝংকার
ব্রিটিশ দেহে লাগে।

গোলামির ওই জিঞ্জির ভাঙা
হুঙ্কার তুমি দিলে,
কলম জোরে অন্যায় রোধে
নির্ভীক তুমি ছিলে।

'চল্ চল্ চল্' ওই রণসংগীত
তোমার অমর সৃষ্টি,
বাংলা কাব্যের কালজয়ী এক
অতুলনীয় কৃষ্টি।

মোঃ রুহুল আমিন
সিইপিজেড, চট্টগ্রাম

ওই বিজয়ের কেতন ওড়ে

ওই বিজয়ের কেতন ওড়ে
ঝরছে তাজা রক্ত,
তারুণ্যের হাত প্রলয়ঙ্কর
ভাঙে বাধা শক্ত।

অটুট থাকে মনোবলে
সামনে যাবার উক্তি,
মানে না তারা অন্যায়কে
লোভ দেখানো ভক্তি।

চির উজ্জ্বল চির চঞ্চল
চলার পথ উন্মুক্ত,
সাহসের বুক বাড়িয়ে দেয়
দেশপ্রেম থাকে যুক্ত।

মজনু মিয়া
মির্জাপুর, টাংগাইল

শরৎ এলে

শরৎ এলে আকাশ জুড়ে
সাদা মেঘের ভেলা,
নীলের মাঝে শুভ্র ছড়ায়
বসে বকের মেলা।

শরৎ এলে শিউলি, বকুল
ফোঁটে কুসুম বাগে,
বিলে-ঝিলে শাপলা ফুলের
পাতায় নাচন জাগে।

শরৎ এলে কাশবনেতে
ছড়ায় শুভ্র আলো,
রাতের বুকে চাঁদের ঝিলিক
দূর করে সব কালো।

প্রভাত হলে শরৎকালে
শিউলি ঝরে ঘাসে,
শিশির পড়ে ফুলের বুকে
মুক্তো হয়ে হাসে।

দোয়েল, শ্যামার মধুর কণ্ঠে
ভাঙে সবার ঘুম,
তাল কুড়াতে, ফুল কুড়াতে
বাগে লাগে ধুম।

মেহেদী হাসান মামুন
সদরঘাট, চট্টগ্রাম

শরৎ বলেই কথা

আকাশবুকে মেঘবালিকা অচিন নীলের দেশে
সাদা রঙের শাড়ি পরে ছুটছে পরির বেশে।
বিলে-ঝিলে শাপলা এবং বুলবুলিদের মেলা
কাকতাড়ুয়া ও কাশফুলে জমছে ভীষণ খেলা।
ভোরবেলাতে শিশিরকণা একটু একটু ঝরে
মিষ্টি রোদের ছোঁয়াতে সে যায় যে আবার সরে।
জোছনামাখা চাঁদের আলো দূর করে রাত কালো
শিউলি ফোঁটা সুবাস ছোটে সকাল বিকাল ভালো।
দোয়েল কোয়েল ময়না টিয়ার সুরের গুঞ্জনিতে
মুখর থাকে সারা দুপুর আনন্দ ধ্বনিতে।
নানান রকম মধুরতা চারিদিকে সজীবতা
এসব শুধু ঋতুর রানি শরৎ বলেই কথা।

জসিম উদ্দিন খান
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম

হয় না দেখা সবুজ ধরা

মনের কথা ছড়ায় ছড়ায় হয় না বোনা আজ
হয় না দেখা সবুজ ধরা, জলের নদী, সাঁঝ
পাই না দেখা সহপাঠীর, নেইকো সহচর
কালের স্রোতে ভেসে গিয়ে সব হয়েছে পর!

কেমন আছে ফুল-প্রকৃতি, প্রিয় সবুজ বন
কেমন আছে জলের নদী, নৌকা, মাঝির মন
কেমন সাজে সন্ধ্যা-আকাশ হয় না দেখা রোজ
কেমন আছে বন্ধু-স্বজন নেইতো কারো খোঁজ।

জীবন ভীষণ ছলচাতুরীর, জীবন মায়াময়
তবু এপথ চলতে হবে, আনতে হবে জয়
সকল বিপদ রুখতে হবে একলা হেঁটে পথ
আঁধার পথে আলোর খোঁজে নিজকে রেখে সৎ।

সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম
ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ

২৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা মোঃ নাহিদ ইসলাম এবং যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার সাথে বাংলাদেশ সচিবালয়ে জাতিসংঘের এইচওসিএইচআর এর প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন

২৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মোঃ নাহিদ ইসলাম বাংলাদেশ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রগতি সভায় সভাপতিত্ব করেন

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মোঃ নাহিদ ইসলাম এবং যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ঢাকায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে 'জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন'-এ ১০০ কোটি টাকার চেক হস্তান্তর বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন

৯ আগস্ট ২০২৪ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস উপদেষ্টাদের সাথে নিয়ে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ৫২'র ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন

৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ঢাকা সেনানিবাসে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে তিন বাহিনী প্রধানদের সাথে সাক্ষাৎ করেন

১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের এক মাস পূর্তি উপলক্ষ্যে ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনা হতে জাতির উদ্দেশে ভাষণ প্রদান করেন